ওঁকার
আলোক মঞ্জির

ওঙ্কার

আলোক মঞ্জির

১৪৩৩

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

বিশেষ রচনা

পুরাণ আর বিজ্ঞান যখন একসুরে কথা বলে :

প্রহ্লাদ রায় গঙ্গে ৯

গল্প

এমনটাই কি ঘটেছিল? : অসীম সেন ১৪

সিঁড়ি এবং : প্রদীপ গুপ্ত ১৭

মেঘের ডানায় : আলো চৌধুরী ২১

রুমেলা : দেবদাস কুণ্ডু ৮৯

বাতাসে বিষের গন্ধ : সপ্তদ্বীপা অধিকারী ৯৬

অরুণাভ এবং সেই মাকড়সাটা : শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় ১৩৩

বড় গল্প

সিকিয়াঝোরার বুনো হাঁস : নমিতা দাশ ৪৪

কবিতা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭

মলয় গোস্বামী ২৮

সৌমিত বসু ২৯

নৃপেন চক্রবর্তী ৩০

কেতকীপ্রসাদ রায় ৩১

তাপস মহাপাত্র ৩২

আর্যতীর্থ ৩৪

অসীম দাস ৩৭

সুবীর সরকার ৩৮

গৌরব চক্রবর্তী ৩৯
পিনাকী রায় ৬২
গৌতম রায় ৬৩
অমিত কাশ্যপ ৬৪
ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য ৬৫
শুভাশিস হালদার ৬৬
প্রদীপ আচার্য ৬৮
সুদীপ্ত মাজি ৭০
অঞ্জনা দে ভৌমিক ৭১
জয়িতা ভট্টাচার্য ৭২
উদয় সাহা ৭৩
পিয়ালী গঙ্গোপাধ্যায় ৭৪
ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল ১১০
ফিরোজ হোসেন ১১১
রাজীব ঘাঁটী ১১২
দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় ১১৩
দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১১৪
জয়িতা বসাক ১১৬
কৌশিক চক্রবর্ত্তী ১১৭
শ্রী সদ্যোজাত ১১৮
সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জী ১১৯
নীলার্ণব চক্রবর্তী ১২০
আক্তারুজ্জামান মিন্টু ১২২
মুনমুন ভৌমিক দাম ১২৪
গৌরীশঙ্কর সিংহ ১২৫
সর্ণালী মণ্ডল ১২৭

ছড়া

ছন্দা ঘোষ ১২৮

গৌতম চক্রবর্তী ১৩০

বিশেষ রচনা

সকলের দুর্গা হতে নেই : সঞ্চয়িতা ঘোষ (সেন) ৪১

নিবন্ধ

কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে :

দেবাশিস পাঠক ৭৬

জীবনে অন্য এক দূর্গা পূজো :

মহাশ্বেতা মুখার্জী ১০৫

শৈশবের দোরগোড়ায় ডিজিটাল প্রহরা :

কণাদ দাশগুপ্ত ১৩৯

বিজয়ার দিন সিদ্ধি তৈরি হত বাড়িতে :

সবুজ মুখোপাধ্যায় ১৪১

সম্পাদকীয়

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ আসে। ভাদ্রের পর আশ্বিন আসে। মানে এসে পড়ে। আশ্বিন এলে অভ্যাস বশত শিউলি ফোটে। পুকুরে শাপলার পাপড়িতে ভ্রমর বসে। শরতের ক্যানভাস-আকাশে সাদা ইজেলের রঙ লাগে। সেই রঙ কাঁপে দিঘির জলে।ধানের ক্ষেতে জিওল মাছে ঘাই মারে। মাঠের শেষে যেখানে আকাশ মাটিতে মেশে, যেখানে শঙ্খচিল হাওয়া কেটে ভেসে যায় পাশের গ্রামে। সে গ্রামে দুগ্গাপুজো হয়। কুমোর পাড়ায় পাঁক-এটেলের সঙ্গে ভুষি মেশানোর গন্ধ বুকে নিয়ে পুজোর গল্প সাজায় কচিকাচার দল। ওদের সাক্ষী রেখেই দেবীর গায়ে রঙ চড়েছিল। দেবীর চোখ আঁকার সময়েও ওদের চোখে পলক পড়েনি। এ সবই হয়েছিল অভ্যাস মত, যেমন টা হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে।পুজো আসলে এদের বাপ শহরে যায় অভ্যাস বসত।দশমীর পর এদের ঘরে নতুন জামা আসে বাপ ফিরলে। দুগ্গা আসে আবাসনেও। মেঘ ছোঁয়া বিল্ডিংটার পার্কিং লটে প্যান্ডালে মা। এ কদিন রাতে স্কচ চললেও দিনে সকলের সঙ্গে খিচুরি মাস্ট। ওই যে গ্রামটার কথা বলছিলাম

সেখানে সুবল বাদ্যিকর, আবাসনে এসেছে ঢাক বাজাতে। ঢাকের বোলে ঠাকুর নাচে। সুবলের গায়ে ঘাম ঝরে, চোখের মণিটা মায়ের মুখের ওপর স্থির। দুপুরে খিচুরি খেয়েছে বেগুনভাজা দিয়ে। রাতে মাংসর কথা আছে। বাড়ির কথা ভাবলে মাংসটা ছিবড়ে ছিবড়ে লাগে। বিজয়ার পর সুবলের ঘরে বোধন হবে। নিওনের আলো থেকে একটু চুরি করে গ্রামের ঘরে প্রদীপ জ্বালাবে সুবল। এসবই চলে আসছে অভ্যাস বসত। একই আকাশ, একই পৃথিবী, আলাদা গল্প। সুবলের জিওন কাঠির গল্প, আবাসনের প্যান্ডোরা বক্সের গল্প। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর। একই বীরেন্দ্র, শরতের খোলা খাম। নদী, আকাশ, ধ্রুবতারা, আকাশগঙ্গা সকলকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে।

বিশেষ
রচনা

পুরাণ আর বিজ্ঞান যখন একসুরে কথা বলে

প্রহ্লাদ রায় গঙ্গে

অধর্মৈণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রানি পশ্যাতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যাতি॥

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, মানুষ যখন ধর্ম ত্যাগ করে চরম পাপে মগ্ন হয়, তখন সেই অধর্মই পুরো সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেয়। ২০২৬ সালে তাপপ্রবাহের কারণে শুধু ইউরোপে ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছে। চলতি বছরে ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে্ প্রাণ হারিয়েছেন সাত হাজারের বেশি মানুষ। নেপালের বন্যাও প্রকৃতির ধ্বংস লীলা দেখিয়েছে আমাদের। তার মানে কি পুরাণের সতর্কবার্তা সঠিক হতে চলেছে? পাপের ঘড়া পূর্ণ হতে চলেছে? বিষ্ণুপুরাণ বলছে

সর্বে চ চোরপ্রায়াশ্চ রাজানো বৈ দ্বিজোত্তম।
দাসপ্রায়াস্তথা লোকা ভবিতারে জনাধিপ॥
অধর্মশীলানি তথা কলৌ সর্বাণি বৈ নৃণাম॥

অর্থ কলিযুগে সমস্ত রাজা বা শাসকেরা মূলত চোর বা দস্যুর মতো আচরণ করবে। সাধারণ মানুষেরা দাসের মতো পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন হয়ে জীবনযাপন করবে।এবং কলিযুগে মানুষের সমস্ত আচরণ ও স্বভাব অধর্মপরায়ণ বা নৈতিকতাহীন হয়ে পড়বে। দ্বাপর যুগের শেষে রাজা পরীক্ষিৎ রাজ্য পরিদর্শনে বেড়িয়ে দেখেন একজন ব্যক্তি একটি ধেনু এবং বৃষকে নির্মমভাবে প্রহার করছে। পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ব্যক্তিকে বধ করতে উদ্যত হলে সেই ব্যক্তি কলি রূপ নিয়ে নিজের পরিচয় দেন। শরণাগতকে বধ ক্ষত্রিয় ধর্ম বিরোধী। পরীক্ষিৎ কলিকে নিজের রাজ্য পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। কলি তখন তাকে থাকার জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্থান ভিক্ষা করেন। পরিক্ষিৎ কলির বাসের জন্য পাঁচটি কলুষিত স্থান নির্দিষ্ট করে দেন। দ্যূতগৃহ, মদিরালয়, ব্যাভিচারি স্ত্রী, হিংসার স্থান এবং এবং অসৎ উপায়ে অর্জিত সোনা। সেটাই কাল হল। কলি ধীরে ধীরে এই পাঁচটি স্থানে নিজের প্রভাব বিস্তার শুরু করে। এবং এই পাঁচটি স্থান গোটা বিশ্বকে নিজের করতলগত করে তোলে ধীরে ধীরে। ভগবত গীতা বলছে,

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

সরল অর্থ, জাগতিক বিষয় বা ক্ষুদ্র মায়ার কথা চিন্তা করতে করতে মানুষের মনে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কামনার সৃষ্টি হয়। আর সেই কামনা কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হলে ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ থেকে মোহ বা বিভ্রান্তি তৈরি হয়, মোহ বুদ্ধি ও স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর ফলে মানুষ কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল তা ভুলে যায়। অবশেষে বিচারবুদ্ধি নাশ হওয়ায় মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পতন ঘটে। নৈতিক পতন ঘটেছে আমাদের। আমরা ক্ষুদ্র মায়ায় নিজেদের বৃহৎ সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছি। পঞ্চতত্ত্বে সৃষ্টি আমাদের বসুন্ধরা। আমরা সেই পঞ্চতত্ত্বকেই অস্বীকার করছি ক্ষুদ্র স্বার্থে। জল বিষিয়ে ফেলছি। বায়ুকে করছি পঙ্কিল, মাটিতে সভ্যতার গরল মেশাচ্ছি ধীরে ধীরে। অগ্নিকে নিজের দাস বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। আকাশ ঢাকছে দূষণের কালো মেঘে।

জলদূষণ

উন্নয়নের নামে শিল্পকারখানার বর্জ্যে থাকা ভারী ধাতু যেমন পারদ, সিসা, ক্যাডমিয়াম জলে মিশছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইকো সিস্টেম। বিষের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে মানুষের জীবনে একটি তৈরি করছে একটি চরম হুঁশিয়ারি। এছাড়াও কলকারাখানা থেকে নির্গত বর্জ্য উচ্চ তাপমাত্রায় থাকে যারফলে জলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমিয়ে দেয়। কৃষিতেও মিশছে বিষ। জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগে নাইট্রেট ও ফসফেট জলে অ্যালগাল ব্লুম বেড়ে যায়। শৈবালগুলো পচে যাওয়ার সময় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শুষে নেয়। অক্সিজেনের অভাবে জলজ জীবের বংশ নাশ ঘটে।

ভূমি দূষণ

জমিতে লাগাতার রাসায়নিক কীটনাশক, প্রয়োগের ফলে মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এটি মাটির উপকারি ব্যাকটিরিয়া মেরে ফেলে, ফলে মাটির

প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস হয়। প্লাস্টিক, পলিথিন এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য মাটিতে মিশে যেতে শত শত বছর সময় নেয়। এগুলো মাটির কণার মাঝের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দেয়। ফলে মাটিতে আলো-বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

ল্যান্ডফিল বা আবর্জনার স্তূপ থেকে বৃষ্টির জলের সাথে মিশে বিষাক্ত তরল মাটির গভীরে প্রবেশ করে। এটি মাটির নিচের ভূগর্ভস্থ জলকেও বিষাক্ত করে তোলে।

বায়ু দূষণ

কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া এবং নির্মাণকাজ থেকে বাতাসে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার ছড়ায়। এগুলো আকারে এত ছোট যে ফুসফুসের ফিল্টার ভেদ করে সরাসরি মানুষের রক্তে মিশে যেতে পারে এবং শ্বাসতন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করে।যানবাহনের ধোঁয়া থেকে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং উদ্বায়ী জৈব যৌগ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ক্ষতিকারক ওজোন গ্যাস এবং ঘন ধোঁয়াশা বা স্মগ তৈরি হয়, যা ফুসফুসের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক।কয়লা ও পেট্রোলিয়াম পোড়ানোর ফলে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড মুক্ত হয়। এই গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে। পরবর্তীতে বৃষ্টির সাথে এই অ্যাসিড মাটিতে নেমে এসে গাছপালা, জলাশয় এবং স্থাপত্যের ক্ষতি করে। বরাহ পুরাণ বলছে

দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমো হ্রদঃ।
দশহ্রদসমঃ পুত্রো দশপুত্রসমো দ্রুমঃ॥

অর্থাৎ দশটি কুয়ো খনন করলে একটি পুকুর খননের সমান পুণ্য হয়। দশটি পুকুর একটি হ্রদের সমান। দশটি হ্রদ একটি সুপুত্রের সমান। আর দশটি সুপুত্রের যত্ন নেওয়ার চেয়ে একটি বৃক্ষ বা গাছ রোপণ করা অনেক বেশি কল্যাণকর। কারণ একটি গাছ প্রকৃতিকে যা দেয়, প্রকৃতি তার বদলে হাজারো জীবকে অক্সিজেন, ফল ও আশ্রয় ফিরিয়ে দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন, উন্নয়নের নেশায় আমরা সেই জ্ঞান ভুলতে বসেছি। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতে দুষ্কৃতো বাপি তাদৃশং লভতে ফলম্॥

যার মানে, একজন কৃষক জমিতে যেমন বীজ বপন করে, সে ঠিক তেমন ফলই কাটে। একইভাবে, প্রকৃতির বুকে মানুষ ভালো বা মন্দ যা-ই রোপণ করুক না কেন, প্রকৃতি তাকে ঠিক সেই ফলই ফিরিয়ে দেয়। আজ আমরা প্রকৃতিকে যে দূষণ দিচ্ছি, প্রকৃতি তা ঘূর্ণিঝড়, মহামারী বা খরা আকারে আমাদের কাছেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। শেষের সীমানায় মানব সভ্যতা। এখনও সময় আছে নিজেদের শুধরে নেবার। নয়তো আবার মহা প্রলয় অবশ্যম্ভাবী।

গল্প

এমনটাই কি ঘটেছিল?

অসীম সেন

বিস্কুটের শেষ কামড়টা দেবার আগেই সেটা তলিয়ে গেল চায়ের শেষ চুমুকে। তর্জনী আর অনামিকাকে বেশ খানিকটা খেলিয়েও গ্লাসের তলানির নাগাল পেল না ড্যামনা। হঠাৎই চোখ পড়ল বড় রাস্তার দিকে। ইংরেজি স্কুলের এক ঝাঁক মামনি। প্রতিদিন দেখে ড্যামনা। প্রতিদিন চোয়া ঢেকুর ওঠে। রাস্তার ওপার থেকে চোখ দিয়ে চিকেন লেগ খাচ্ছিল বিশু। শালা শান্তির ছেলে। নিজের অজান্তেই কানচাপাটিতে হাত বোলালো ড্যামনা। বিশুর গায়ে হেব্বি জোর। পাঁচ ভাই, পাঁচটাই যন্তর। শালা বাপের ঠিক নেই। বিশুটাকে একটু এড়িয়েই চলে। বিশুদের সংসারে চালডালের অভাব কোনওদিনই ছিল না। বাপ মা দুজনেই অন্ধ। বাপটা জন্ম থেকেই কানা। মা-টা বিয়ের পর। বাপ ঠাকুরদার ব্যবসা। আগে কাকাই দেখত। মানে বিশুর বাপ। কাকাটাও পটকে যেতে বাপের হাতে ব্যবসা। ধরা ব্যবসা খুব একটা দেখতে হয় না। তাছাড়া এক ঠাকুরদা আছে। বুড়ো হয়েছে কিন্তু কষ আছে। বিয়ে করেনি। একটা ঘরে পড়ে থাকে আর অহেতুক মাতব্বরি করে।

সেদিন একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিল ড্যামনা। তার ওপর শুওরের মাংস। গা-টা গোলাচ্ছিল। মাথাটাও কাজ করছিল না। রাস্তার ওপার থেকে আসছিল পাঞ্চালী। মালটা জুবলি বারে নাচে। ভগা ব্যাটা বেশ যত্ন করে বানিয়েছে। শালী ইচ্ছে করে নাভির তলায় কাপড় পরে। তবে সেদিন ড্যামনা, মাগীকে বাজে চোখে দেখেনি। পাটা টলছিল বলেই

ধাক্কাটা খেয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা এদিকটা কেউ আসে না। ধাক্কা খেয়ে শালী বলে কিনা, অন্ধের ছেলে অন্ধ। মাথায় কেমন আগুন জ্বলে গেল। শালীকে একটা ধাক্কা দিতেই পড়ে গেল। বুকে একটা পাঞ্জাও মেরেছিল বোধহয়। হঠাৎ কানের পাশে বিরাশি শিক্কার একটা চড়। এ সময়ে বিশু কোথা থেকে ফিরছিল কে জানে। এক পাঞ্চালী পাঁচ নাগর। পাঁচটাকেই বড়শিতে খেলাচ্ছে। বিশুকে দেখতেই সতীপনা আরও বেড়ে গেল ছিনালের। মাগী যত কাঁদছিল বিশুর হাত পা তত চলছিল। সেদিন থেকে ঢ্যামনা কসম খেয়েছে পাঁচটাকে একসঙ্গে টাইট দেবে। শালা বেজন্মার দল বাপের ঠিক নেই। ঢ্যামনা বাপকে বলেছিল ওই পাঁচ ভাইকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে। কাকিটা মাইরি বিষমাল। বাপকে ঠিক কবজা করেছে। আর ঠাকুরদাও বেঁকে বসল। ঠাকুরদার মুখের ওপর কথা বলতে গেলে কেমন যেন জিভ শুকিয়ে যায় ঢ্যামনার।

ছোট বেলা থেকেই খুড়তুতো ভাইগুলিকে.সহ্য হয় না। ওরা সামনে এলেই কেমন যেন গুটিয়ে যেত। সে আর তার একগাদা ভাই। সব জায়গায় খ্যাকসার পাত্র হয়েছে। বিশুদের আলাদা চোখে আর তাকে আলাদা চোখে দেখত সকলে। ঘরে একটা টিচার দিয়েছিল বাপ। বিধবা কাকীটা বিশুদের জন্যও একই টিচার রেখেছিল। কথায় কথায় খোটা খেতে হত। বিশুটাকে একদিন ছোট বেলায় ফলিডল খাইয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল ঢ্যামনা। পাড়ার লোকেরা জল থেকে তুলে হাসপাতালে দিয়েছিল। হেব্বি কড়া জান। বেঁচে গিয়েছিল। তারপর থেকেই কেউ কাউকে দেখতে পারে না। ঢ্যামনাদের গ্রামের শেষে একটা সিনেমা হল আছে। তার পিছনেই নদীপাড়ে ইটভাঁটা। সেখানেই ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বসে ঢ্যামনা। বিশুরাও আসে মাঝমধ্যে। বিশুর সেজো ভাইটাকেও একদিন ইটের খাঁজে একদিন দেখেছিল পাঞ্চালীর সঙ্গে ঘসটাঘসটি করতে। তলপেটের কুলকুলানিটা বেড়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। করণ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বেশ্যার ছেলেগুলোর কপাল সবদিক থেকে ভালো। কোন এক মাসতুতো ভাইকে পার্টনার করে সাইড বিজনেস করছে। মালপত্তর ভালোই কামাচ্ছে চলাফেরা দেখলেই বোঝা যায়। বিশুর ঠাকুরদা বলছিল এমন ভাই নাকি ভাগ্যের জোরে পাওয়া যায়। বি এ পাস। ভালো বাঁশি বাজায়। আবার ব্যাবসাতেও চৌকষ। পাঞ্চালীও কানুদার নামে দু' ঢোক জল বেশি খায়। নিজের ভাগ্যকে দোষে ঢ্যামনা। ছোটবেলায় ক্লাস সেভেনে একবার অঙ্কে সাতানব্বই পেয়েছিল। খারাপ কী ছিল? কিন্তু কোনওদিন পাত্তা পায়নি। প্রাণের দোস্ত বলতে করণ। সেই ছোট বেলায় একবার লেড়ো বিস্কুট খাইয়েছিল। তারপর থেকেই ঢ্যামনার সাথে সাথে ঘোরে। আর কাছের বলতে মামা। পোলিওতে একটা পায়ে জোর পায় না। তাদের বাড়িতেই থাকে। বিশুকে বলতে গেলে একমাত্র মামাই বোঝে। তবে হাতটানের স্বভাব আছে। এপাশ ওপাশ থেকে যা কামায় তার বেশিরভাগ উড়িয়ে দেয় জুয়ায়।

সেদিন সকাল থেকেই শরীরটা ভালো ছিল না ঢ্যামনার। ও দিক থেকে বাপ বাওয়াল দিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসার হিসেব নাকি মিলছে না। অনেক রাতে ফিরেছে, চোখটা তখনও জ্বালা জ্বালা করছিল। মাথাটা ভার। একটু লেবু জল পেলে ভালো হত। কানখাড়া করে শুনল কাকি পাশের ঘর থেকে চিল্লাচ্ছে ঢ্যামনাই নাকি টাকা সরিয়েছে গদিঘর থেকে। মাথায় আগুন জ্বলে গেল। শালা কতদিন হল গদিঘরের দিকে ঘেষেনি পর্যন্ত। ঠাকুরদাও বাইরে দাঁড়িয়ে তরপাচ্ছে। শালা যে থালায় খায় সেই থালাতেই হাগে। ঘর থেকে বেড়িয়ে কাকীকে রাগের মাথায় বেশ করে খিস্তি ঝাড়ল ঢ্যামনা। বাপটা চুপ মেরে আছে।ঠাকুরদা কিছু একটা বলছিল। মাথায় ঢুকছে না ঢ্যামনা। আবাগীর ব্যাটাগুলি ঘরে থাকলে এখনই একট কিছু ঘটে যেত। শালা নিজের বাপের সম্পত্তি নিজে চুরি করতে যাবে কোন দুঃখে? রাগের মাথায় কলতলার বালতিতে একটা লাথি মেরে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেল।

ইটভাটায় নদীর পারে বসে আছে করণ। ঢ্যামনার একটা ভাইও বসে আছে। আদাকুচি ছাড়াই দু’ গ্লাস পর পর ধেনো মেরে দিল ঢ্যামনা। মাথায় আগুন জ্বলছে। কী ভেবে কোমরে মেসিনটা গুঁজে নিয়ে এসেছে ঢ্যামনা। শালা এর থেকে একটা এসপার ওসপার হয়ে গেলেই ভালো। হঠাৎ একটা বাইকের আওয়াজ। বিশুরা পাঁচ ভাই মিলেই আসছে যেন। চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছে ঢ্যামনার। আবছা শুনতে গোলমালের আওয়াজ। করণ কিছু একটা বলতে গেল। মাথায় বোধহয় রড খেয়েছে। পড়ে যাচ্ছে করণ। বিশুর পরের ছোট ভাইটা মাটিতে পড়ে আছে। বুকে রক্ত। ছুরি খেয়েছে? মাথা কাজ করছে না ঢ্যামনার। মেসিনটা বের করল। সামনে বিশু। ঝাপসা হয়ে আসছে বারবার। কী একটা খিস্তি মারল বিশু। ঢ্যামনার মাথা কাজ করছে না। মেসিনটা তুলল। হঠাৎই তলপেটে অসহ্য ব্যথা। মাদারবোর্ডটা ক্ষুর চালিয়েছে। রক্ত বেরোচ্ছে। মাটি নিল ঢ্যামনা। জল তেষ্টা পাচ্ছে। সামনে নদী। অথচ এতটুকু জল নেই খাওয়ার জন্য। মা এর কথা মনে পড়ছে ঢ্যামনার। দূরে করণটা পড়ে আছে নড়ছে না। ওটাকেও শেষ করে দিয়েছে বোধহয়। চোখ বুঝতে বুঝতে দেখল কানু দূর থেকে মিটিমিটি হাসছে। আকাশ বাতাস সব এক হয়ে গেল ঢ্যামনার।

গোটা ইটভাটা যেন এক কুরুক্ষেত্র ময়দান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা শরীর। এ গ্রামে এসব আকছার ঘটে। দুদিন আন্ডারগ্রাউন্ড থাকলেই সব থিতিয়ে যাবে। এবার এখান থেকে সরে যাবে বিশু আর কানুর দল। কানু সোজা চলে যাবে কলকাতায় বন্ধুর মেসে। বিশুরা বোধহয় জামসেদপুর। মনে মনে বেশ খুশি কানু। নিজের ব্যবসার জন্য বেশ খানিকটা পুঁজি সরিয়ে নেওয়া গিয়েছে বিশুর হাত দিয়ে। শালা পাঁচ ভাইই গাম্বাট। সবই বুঝল কিন্তু কানুর খেলা বুঝল না।

গল্প

সিঁড়ি এবং

প্রদীপ গুপ্ত

মুখকথা

তড়বড় করে সিঁড়ি ভাঙছিলো অপূর্ব। অনেক অনেক দেরি হয়ে গেছে ওর। দীপুদা বলে দিয়েছিলেন সাড়ে তিনটার পর তিনি আর অফিসে থাকবেন না। ফ্যামিলির সাথে পুজোর কেনাকাটা করতে বেরোবেন। "সেইদিন কোনোদিন" পত্রিকার সাব এডিটর দীপঙ্কর লাহিড়ীর মতো মানুষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন! এটা ভেবে "সেইদিন কোনোদিন"পত্রিকার জন্য গল্প নামাবে কী দুদিন ধরে ঠিকমতো ঘুমোতেই পারেননি অপূর্ব মোদক। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কাঁধের ঝোলাব্যাগে ওর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস — "মিছে কথার ডালপালা"র ভেতর সযত্নে পাটপাট করে রাখা আছে পত্রিকাতে জমা দেবার জন্য লেখা গল্প— "সেদিন অমানিশায়"।

আজ যাতে ঠিকঠাক সময়ে আসা যায় সেজন্য গতকালই বাজার হাট সেরে রেখেছিলেন অপূর্ব। কিন্তু এটা আদৌ মাথায় ছিলো না যে ইলেকট্রিক বিল জমা দেবার আজই শেষ দিন। ভিক্টোরিয়া হাউসটা যেহেতু পত্রিকা অফিসের কাছাকাছি তাই অপূর্ব আর পাড়ার ক্যাশ কাউন্টারে জমা না দিয়ে একেবারে ভিক্টোরিয়া হাউসেই জমা দেবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। ব্যাস এখানেই যত বিপত্তি। ইতিমধ্যেই দশ মিনিটের মতো লেট করে ফেলেছেন তিনি।

আড়াই তলার ল্যান্ডিং-এ পা রেখেছেন সবে। ব্রিটিশ আমলের বিল্ডিং। একটা তলা মানে কমপক্ষে দেড় তলা তো হবেই, আর এখানে এই আরেকটা সমস্যা, কোনো লিফট নেই। তিনতলায় উঠবেন ভেবে পা বাড়াতেই— ব্যাস। পা আটকে গেলো অপূর্বর।

কাহিনীর কাহিনী

বাঁ হোক বা ডান, কোনও পাকেই একচুল নড়াতে পারছেন না অপূর্ব। দু'হাতে পাদু' টোকে ধরে অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই দুটো পায়ের একটাকেও এতটুকুও নাড়াতে পারছেন না। কী হচ্ছে বুঝতে পারছেন না কিছুতেই, প্যারালাইজড হয়ে গেলো নাকি পা দুটো? উঁহু, সেরকমটা হলে তো পায়ে কোনও সাড় থাকতো না। তিনি চিমটি কেটে দেখলেন, ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন। তাহলে হলো টা কী? সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে। মারাত্মকভাবে ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছেন অপূর্ব। ঠিক এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর। গমগমেও না আবার রিনরিনেও না। অবিকল যেন অপূর্ব নিজের গলা নিজেই শুনতে পাচ্ছেন।

— কী হলো ভয় পেয়ে গেলেন অপূর্ব মুখার্জি?

অপূর্ব কী উত্তর দেবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। ভয় যে পেয়েছেন এটা তো ঠিক কথাই, কিন্তু সে কথা বলাটা কি আদৌ ঠিক হবে? তাছাড়া গলাটাই বা কার? এ তো মনে হচ্ছে যেন নিজের গলাকেই নিজে শুনছেন তিনি।

— আমি, মানে আমরা সিঁড়ি। আপনার জীবনে যত সিঁড়ি আপনি এ পর্যন্ত ভেঙেছেন সেই সব সিঁড়িরা আজ একসাথে হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

— সিঁড়ি! কথা বলা? জীবনে যত সিঁড়ি! আমি তো কিছু —

— আপনার জীবনের প্রথম সিঁড়িটার কথা আপনার মনে আছে? মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক। আপনি তখন সবে হামাগুড়ি দেওয়া শেষ করে টলোমলো পায়ে হাঁটছেন। আপনার গাঁয়ের বাড়ি। হ্যাঁ, সেই অজয়ের ধারে মাটির দাওয়া আর উঠোনের মাঝে দুটো মাটির সিঁড়ি ছিলো। মনে আছে আপনার? রোজ সকালে আপনার মা, সরমাদেবী সেই

দুটো সিঁড়িতে গোবর জলের ছিটে দিয়ে ঘর লেপার ন্যাকড়ায় লিপে দিতেন সেই সিঁড়ি দুটোকে?

অপূর্ব মনে করার চেষ্টা করছেন। হাল্কা হাল্কা কি মনে পড়ছে অপূর্বর? না কি একটা কল্পছায়া! ওর মায়ের মুখটা মনে পড়ছে অপূর্বর — মাটির দাওয়ায় মায়ের কোলে বসে — কিন্তু সে সিঁড়ি তো ইট দিয়ে বাঁধানো ছিলো।

— হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ওটা আপনার জীবনের দ্বিতীয় সিঁড়ি। সেবারে যখন অজয়ের জল এসে আপনাদের ঘরের খাট ছুঁয়ে ফেলেছিলো, সেবারে আপনার বাবা সুবিমল বাবু ঘরের চালের টালি নামিয়ে টিনের ছাউনি করেছিলেন। আর মেঝেটাকেও প্রায় তিনফুট উঁচু করে সিঁড়িটাকে আর ভিতের চারপাশ ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার তখন বয়েস বছর তিনেক হবে।

সুবিমল মোদকের সুঠাম চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো অপূর্বর। কন্ঠিতে তুলসীর মালা, নিত্যদিন কপালে তিলক আঁকতেন সুবিমল। বাহুতে গলায় চন্দনের ছোঁয়া দিতেন। বাবার কাছে সেই ছোটবেলাতেই পদাবলী শুনে শুনে, কতো পদাবলীই যে তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছিলো অপূর্বর। কন্ঠে যেন যাদু ছিলো সুবিমলবাবুর।

আপনার জীবনের তৃতীয় সিঁড়ি হলো আপনাদের বাড়ির পশ্চিমদিকের বাঁশঝাড়ে ঘেরা পুকুরপাড়ের ঘাট। একটা তাল গাছকে কেটে তিন'টুকরো করে দুপাশের বাঁশের খুটি দিয়ে বেঁধে ঘাট বানিয়েছিলেন আপনার বাবা। ওটা নামে ঘাট হলেও আসলে সিঁড়িই। জল থেকে ডাঙায় আর ডাঙা থেকে জলে ওঠানামা করার যাদুকাঠি।

অনেকটা জমি নিয়ে ছিলো অপূর্বদের বসতবাড়ি। জমির পূবে অজয়ের নাবাল। দক্ষিনে গাঁয়ের রাস্তা, পশ্চিমে পুকুর। আটকাঠার পুকুর হলেও পুকুরপাড় ধরলে প্রায় বিঘে খানিকের অঞ্চল। ছেলেবেলার দামালপানার ছবি ভেসে উঠছে অপূর্বর চোখে। পাঁচশালী না হলে বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটতেন না সুবিমল। আর সেই বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো ছিপ নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিগুলো যে কী মজাতেই না কাটতো অপূর্বর।

— এতোটা ভাবার সময় নেই আপনার হাতে। দীপঙ্করবাবু বসে আছেন আপনার অপেক্ষায়। পরের পর ভেবে যান শুধু। প্রাইমারী স্কুলের সিঁড়ি। মনে আছে? একদিন সেই সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে আপনার মাথা ফেটে গেছিলো? চারটা স্টিচ পড়েছিলো মাথায়? সেই দাগ কিন্তু আপনার চুলের আড়ালে এখনও আছে। চুল আঁচড়াতে গেলে...

নিজের অজান্তেই মাথায় হাত চলে আসে অপূর্বর। এই যে বাঁ দিকে যেখানে সিঁথির লাইনটা গেছে তার ঠিক ওপরেই —

— আপনার জীবনে একটা বড় কৃতিত্ব কি জানেন? টপাটপ করে একেরপর এক সিঁড়ি ভেঙেছেন কিন্তু কোনো সিঁড়ির কথাই মনে রাখেন নি। প্রাইমারি, হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, পাশ করে এসে কোথাও একদিনের জন্যও ফের দেখা করতে যাননি সেসব

ইন্সটিটিউশনের শিক্ষকদের মানে আপনার জীবনে ওপরে ওঠার সিঁড়িদের সাথে! এমনকি যে গ্রাম আপনাকে খাইয়ে পড়িয়ে বড় করলো— শহরে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসে, সেই যে গ্রামের বাড়ি ছাড়লেন ব্যাস, এমনকি আপনার নতুন ফ্লাটে পর্যন্ত আপনার বাবা মাকে একদিনের জন্যও—

থাকগে সেসব কথা। আচ্ছা অপূর্ব, আপনার সুমিতা রায়ের কথা মনে পড়ে? সত্যি ওকেও যে ভুলে যাবেন, মানে ভুলে যাওয়া যে যায়! তিনি যদি তার বাবার সাথে আপনার পরিচয় না করিয়ে দিতেন, মানে নির্মলবাবু, নির্মলকান্তি দাশ। "চলাচল0 পত্রিকার সম্পাদক নির্মলবাবুকেও যে আপনি ভুলে যাবেন...

আচ্ছা, আজ এই দীপঙ্কর বাবুর অফিসের সিঁড়িতে পা রাখার আগে আর কতগুলো পত্রিকার অফিসের সিঁড়ি আপনি ভেঙেছেন তার কোনো হিসেব রেখেছেন আপনি! অক্লেশে সিঁড়ি ভেঙেছেন — সিঁড়ি ভেঙেছেন আর সিঁড়ি ভেঙে গেছেন। এ পর্যন্ত আমরা আপনাকে এনে পৌঁছে দিয়েছি খ্যাতির চূড়ায়। আপনি কিন্তু আমাদের এতোটুকুও মর্যাদা দেন নি কখনও। কখনোই ভাবেন নি যাদের হাত ধরে আপনি অপূর্ব মোদক আজ অপূর্ব মোদক হলেন তাদের কাছেও একটা মিনিমাম কৃতজ্ঞতাবোধ আপনার থাকা উচিত। থাকা উচিত ছিলো। আপনার অহংকার আপনাকে দিনরাত শিখিয়েছে আপনার যোগ্যতা আপনাকে এখানে এনেছে। কিন্তু সেই সব বাড়িয়ে ধরা হাতগুলো — সেইসব সিঁড়িগুলো — আজকেও কিন্তু আমরা আপনার উপকারের কথা ভেবেই আপনার পথ আটকালাম। কেন জানেন? দীপঙ্কর বাবুর টেবিলে এখন তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন সেই নির্মলবাবু। "চলাচল0 পত্রিকার সম্পাদক নির্মলকান্তি দাশ। আর তাঁর মুখোমুখি যদি একবার আপনি পড়েন তাহলে —

অপূর্ব এতোক্ষণ ধরে চুপ করে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন। শুনে যাচ্ছিলেন বললে বুঝি ভুল বলা হবে। তিনি দেখছিলেন। যেন একটা সাদাকালো ছবির রিল তার চোখের সামনে কেউ ঘুরিয়ে চলছিলো। এই বোধহয় প্রথমবারের মতো একটা তীব্র অনুশোচনা বোধ জন্ম নিয়েছে ওর মনে। সরমাদেবী... সুবিমলবাবু... সবার মুখগুলো ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। অপূর্ব নীচের দিকে নামার জন্য পা বাড়ালো। পা দুটো দিব্যি উঠে এলো সিঁড়ির বুকের থেকে। আজই সে গ্রামের বাড়ি যাবে। আজ থেকেই সে শুরু করবে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা। জীবনে যত সিঁড়ি ও ভেঙেছে, যত এগিয়ে দেওয়া হাত ধরে উঠে এসেছে উপরে সবার কাছ গিয়ে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। নীচু হয়ে ও সিঁড়িটাকে ছুঁলো। তারপর হাতটাকে নিয়ে এলো মাথায়। আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিলো চুলের গোড়ায় গোড়ায়।

গল্প

মেঘের ডানায়

আলো চৌধুরী

'আমার চলা যায় না বলা, আলোর পানে প্রাণের চলা, আকাশ বোঝে আনন্দ তার..।' ডোর বেলের মিউজিক। মালবিকার রেন্টেড ফ্ল্যাটের ডোর বেল। তাতেই বাজছে বিশ্বকবির গানের 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল-পারা'-র সুর। কিন্তু এত রাতে! ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টার ঘরে। পাড়া প্রায় নিশুতি। দু-একটা গাড়ির যা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

মালবিকা তার মালকিনকে বলে দরজায় ইলেকটনিক ডোর বেল করিয়ে নিয়েছে। তার কলিং বেলের সুর সবার পছন্দ। চ্যানেল ১৫-র অ্যাসোসিয়েট প্রোডিউসার হরিতা এখানে এলে বার বার ডোর বেল বাজায় শুধু মিউজিকটা শোনার জন্য। হরিতা গুজরাটি। সে জানে না এটি রবীন্দ্রনাথের গান, কিন্তু এই সুর তার ভারি পছন্দের। মারাঠি সন্ধ্যা

যোশীও মালবিকার ফ্ল্যাটের দরজায় লাগানো বেলের মিউজিকের কথা ক্যান্টিনে এত বলেছে যে, ডোর বেলের মিউজিক শুনতে অনেকেই এসেছে মালবিকার কাছে।

কে বেল বাজাচ্ছে? ওয়াচম্যান কেশব নিশ্চয়ই মেন গেট খুলে দিয়েছে। না দিলে তো কেউ ঢুকতে পারবে না। কেশব কী এই আগন্তুককে চেনে? মালবিকা ভাবছে। একটু দ্বিধায়। দরজা কি খুলবে? তার ফ্ল্যাটের মূল দরজা পিপিং উইন্ডো গ্লাস হীন। তাই দেখার কোনও উপায় নেই। এই নিয়ে কথা বলেছে সে মালকিনের সঙ্গে। তিনি কথা দিয়েছেন। সামনের মাসের শুরুতেই করে দেবেন। কিন্তু এখন মালবিকা কি করবে? এমনও হতে পারে, খুব প্রয়োজনে কেউ এসেছে। মনে সাহস এনে দরজা খুলল মালবিকা। দেখেই চমক। বিস্ময়।

তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আগন্তুক ভিতরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। মালবিকাকে সোজা টেনে নিয়ে গিয়ে তার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল। মালবিকা কিছু বুঝে ওঠার আগে তার গলায় জড়ানো সুতির ওড়না মাথায় ঘোমটার মতো জড়িয়ে দিল। ফিস ফিস করে বলল, নাউ ইউ আর মাই ওয়াইফ। এখন তোমাকে ঠিক বিবাহিত মনে হচ্ছে। ভেরি সুন পোলিশ উইল কাম। ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, গো টু কিচেন অ্যান্ড মেক কারি। ইউ মাস্ট মেক ইট ক্লিয়ার টু পুলিশ ইন এভরি ওয়ে দ্যাট আই আম ইয়োর হাসব্যান্ড, ইফ দে এন্টার ইন রুম অ্যান্ড আস্ক অ্যাবাউট মি। দিস ইজ মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট। আজ যদি বেঁচে যাই তোমার হাতের বাঙালি রান্না খাব। তারপরেও যদি বেঁচে থাকি তাহলে...। থাক সে পরের কথা। নাউ টেক টু মি দ্য ওয়ে আ ওয়াইফ উড...। যেভাবে একজন স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবহার করে সেভাবেই করবে। অবাক মালবিকা। তার কাছে বিস্ময়ও যেন হার মানবে এই মুহূর্তে।

এই মধ্যরাতে আসা ব্যক্তি মালবিকার অতি পরিচিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আচরণে তাঁকে অপরিচিত লাগছে মালবিকার। তাদের মিডিয়া অফিসের পদস্থ কর্তা রাকেশ রাও এখন মালবিকার ঘরে। কিন্তু কেন? এভাবে মালবিকাকে স্ত্রী সাজতে কেন বাধ্য করছেন? কি এমন গর্হিত কাজ তিনি করেছেন যা থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে অবলম্বন করতে হচ্ছে মালবিকাকে? কি হতে পারে? কেনই বা পুলিশ আসবে?

মালবিকা কোনও প্রশ্ন করার অবকাশ পায়নি। নিজেকে স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু চিন্তা ফুটে উঠছে তার মুখে। এমনিতে তার মুখ কমনীয়তায় ভরা। একটা অদ্ভুত শান্তভাব রয়েছে তার মুখমণ্ডলে, যেন গভীর কোনও শান্ত দীঘি... যার তলা স্পষ্ট দেখা যায়। মালবিকা তেলেগু, মারাঠি ভাঙা ভাঙা বলতে পারে। ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী। ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর। রাকেশ মালবিকাকে দেখেছে অফিস চত্বরে। আলাপ গভীর হয় কর্মসূত্রে, নন লিনিয়ার এডিটিং-এর দৌলতে। কিচেনে গিয়ে মালবিকা

ভাবছে এখন সে কি করবে? বাধ্য মেয়ের মতো কাজ করবে নাকি ...। অফিস ক্যান্টিনে রাকেশজির সঙ্গে মালবিকার প্রথম আলাপ। কি হাসিখুশি......। মনে পড়ছে মালবিকার ...

একদিন ক্যান্টিনে ঢুকেই হরিতার সঙ্গে মালবিকাকে দেখে উচ্ছ্বসিত রাকেশ তাকে বলেছিল, হাউ আর ইউ মালবিকা? মালবিকা থতমত। রাকেশ তাদের মিডিয়া অফিসের অনেক উঁচু পদে। মালবিকা জানে। কিন্তু তিনি মালবিকাকে বাই নেমে চেনেন এটা তার কাছে অবাক লেগেছিল। মালবিকা জাস্ট কপি-এডিটর। ইংরেজিটা ভালো জানে বলেই চাকরিটা তার হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কিছুই সে জানে না। সম্প্রতি নন লিনিয়ার এডিনিং -এ জোর দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। কপি এডিটর, ডেস্ক ইনচার্জ, সবাইকে শিখতে হবে। সেদিন এই রাকেশজি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। মালবিকার ভীষণ মনে পড়ছে তখন বেলা ১২টা কি সাড়ে ১২ টা।

ক্যান্টিনে ঢুকেই তাদের টেবিলে একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন রাকেশ। রাকেশকে দেখে তারা উঠে দাঁড়িয়ে উইশ করেছিল। আরে বসো বসো। উঠছো কেন, বলেছিল রাকেশ। তারপর মালবিকার দিকে তাকিয়ে

— হাউ ইজ ইয়োর নন লিনিয়ার এডিটিং গোয়িং অন?

— ওয়েল, স্যার বলেছিল মালবিকা। একটু থেমে মালবিকা বলেছিল, নন লিনিয়ার এডিটিং ইজ ভেরি টাফ, আই থিং সো।

রাকেশ হেসেছিল। আসলে সবে শিখছো বলে মনে হচ্ছে। ইটস নট আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট। পরে দেখবে জল-ভাত হয়ে গিয়েছে। তখন আর লিখতে ইচ্ছে করবে না। মনে হবে সবাই লেখা দিক, বসে বসে শুধু ভিস্যুয়াল এডিট করবো। এনি প্রবলেম, ইউ ক্যান কাম টু মাই ন্যাশনাল ডেস্ক। ওখানে তো এডিটিং হয়। দেখিয়ে দেব। বাট বাই নাইন এএম ইউ হ্যাভ টু কাম। আসলে রাকেশ রাও অফিস চত্বরেই থাকেন। কোম্পানি অ্যালট করেছে। অফিসে ঢোকেন সকাল ৮.৩০ মিনিটে। রাতে নিজের রুমে যান। মাঝে মধ্যে মার্কেটে যান। সেজন্য অফিসই গাড়ি দিয়েছে। মালবিকা ভাবতেই পারছে না রাকেশজি তাকে শিখিয়ে দেবেন। একমুখ হেসে সে বলেছিল, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

হাসলে মালবিকাকে আরও সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন ঠোঁটের কোণ দিয়ে মুক্ত ঝরছে। রাকেশের মনে হল এত সুন্দর হাসি সে কখনও দেখেনি। হরিতাও হাসছে। গুজরাটি চ্যানেলের সে অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডিউসার। হরিতা বলেই ফেলল, দ্যাখ মালবিকা তোর তাহলে গতি হয়ে গেল। মালবিকা মুখে তখন লজ্জার আভা।

মালবিকা শুধু বলেছিল, ওকে স্যার। রাকেশ বলেছিল, বাই দ্য বাই আই অ্যাম নট ইয়োর স্যার। কল মি বাই মাই নেম। মালবিকা বলেছিল, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাকেশের ঝটিতি জবাব, হোয়াই নট? একটু থেমে বলেছিল।

মালবিকা নামটা ভীষণ বড়। আমি মলি বলে ডাকবো। মালবিকা ঘাড় নাড়ল। এখানে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। নামের আগে কখনও সখনও একটা মি. মিসেস বা মিস যোগ করে দেয়।

রাকেশের ক্যাবিনেটে সেই যাওয়া শুরু মালবিকার। নিউজের অন্দিগন্দি এবং নন লিনিয়ার এডিটিং রাকেশের কাছেই শিখেছে মালবিকা। এরমধ্যে কলকাতার কলেজস্ট্রিটের কফি হাউস নিয়ে একটা স্টোরির এডিটিং করে ভিস্যুয়াল এডিটিং-এ প্রাইজও পেয়েছে মালবিকা। রাকেশ একেবারে পাখি পড়ানোর মতো এডিটিং-এর সবটুকু উজাড় করে শিখিয়েছিল মালবিকাকে।

রাকেশ ছত্তিশগড়ের রায়পুরের ছেলে। বাংলা চমৎকার বোঝে। বলতেও পারে। মালবিকাকে রাকেশের ভালো লাগে। মিডিয়া হাউসের ন্যাশনাল ডেস্কের শীর্ষপদে রাকেশ কিন্তু আদতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, গোল্ড মেডেলিস্ট। ইংরেজিতে দুর্ধর্ষ। ম্যানেজমেন্ট তাকে ভীষণ পছন্দ করে। অফিসই তার ধ্যানজ্ঞান। শুধু এডিটোরিয়ালই নয়, প্রোডাকশনেও দর। বছরে একবার রায়পুরে যায়। মা অধ্যাপিকা। রাকেশের মা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনি। মালবিকাও প্রেসির শুনে রাকেশ খুশি হয়েছিল। সে কারণেই কী তার প্রতি বাড়তি টান অনুভব করে রাকেশ? মালবিকা এতকিছু তলিয়ে ভাবেনি। কিন্তু... আজ এই মুহূর্তে রাকেশজির... আচরণে সে বিমূঢ়।

বাইরে বেল বাজছে। বেলের শব্দে সম্বিত পেতেই মালবিকা কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। একদম স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। রাকেশ মালবিকার বেডরুমে। হাতে একটি নামী ইংরেজি পত্রিকা। বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায়। চোখ ম্যাগাজিনের দিকে। কান খাড়া। মালবিকা আড়চোখে দেখেনিল রাকেশকে।

খুব স্বাভাবিকভাবে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে মালবিকা বলল, হু আর ইউ?

— ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এল পুলিশ। ওপেন দ্য ডোর প্লিজ ম্যাম।

— ওয়েট। আই অ্যাম ওপেনিং। বলল মালবিকা। দরজা খুলতেই পুলিশের প্রশ্ন, ডিড সামওয়ান এন্টার ইয়োর রুম? ডিড ইউ হিয়ার এনি সাউন্ড অর দ্য ডোর বেল?

— মালবিকা বলল, নো।

— মে উই নো ইয়োর আইডেন্টিটি?

— অফ কোর্স। আই অ্যাম বেঙ্গলি, কামিং ফ্রম দুর্গাপুর। নিজের অফিসের কার্ড দেখালো মালবিকা।

— ওকে ওকে ম্যাম। সরি টু ডিসটার্ব ইউ। এবার মালবিকা বলল, আমি কি জানতে পারি আপনারা কেন এসেছেন এই মাঝরাতে? মে আই আস্ক দ্য রিজন ফর ইয়োর ভিসিট?

পুলিশ অফিসারেরা যা বলল, তার সারৎসার এক ভয়ংকর মাওবাদী এই চত্বরে ঢুকে পড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে এমনই খবর তাদের কাছে। সে উচ্চশিক্ষিত। ভদ্র বাড়ির ছেলে।

মাওবাদীদের নিয়মিত অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। আমরা এই চত্বরের সব বাড়িতে সার্চ করব। গুড নাইট ম্যাম।

মালবিকার মুখ ভাবলেশহীন। পুলিশকে সে বুঝতেই দিল না। সে বাঙালি। বিখ্যাত মিডিয়া হাউসের কার্ড তাকে বাঁচিয়ে দিল। সবমিলিয়ে তাদের কোনও সন্দেহ রইল না।

দরজা বন্ধ করে মালবিকা রান্নাঘরে ঢুকে এক গ্লাস জল খেল। তার রান্নাও শেষ। মাছের ঝোল, আলু ভাজা আর পাঁচমিশালি ডাল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর মালবিকা শোবার ঘরে এসে দেখল, রাকেশজি ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে হাত না দিয়ে কিভাবে ডাকা যায় মালবিকা সেটাই ভাবছিল। টিভি চালিয়ে দিল। খুলতে না খুলতে এই খবর...এই মুহূর্তে যার সাক্ষী সে। টিভির শব্দে রাকেশের ঘুম ভেঙে গেল। সে বেরুনোর উদ্যোগ নিতেই মালবিকা তার হাত চেপে ধরল। প্লিজ আপনি বেরবেন না। বার বার পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে। রাকেশ কিছুতেই থাকবে না।

এবার মালবিকা বাধ্য হল বলতে, আপনি তো আমার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। আজ যদি স্ত্রী আপনাকে বাধা দিত আপনি কি শুনতেন না?

সেই রাতে মালবিকার সঙ্গে অনেক গল্প করেছিল রাকেশ। তার জীবনের গল্প। অধ্যাপিকা মায়ের কথা। মাওবাদী পরিবারের সন্তানদের বিনা পয়সায় তাঁর মা পড়াতেন বলে, এক রাতে পুলিশ এসে তার মাকে ধরে নিয়ে যায়। সেদিন হাউ হাউ করে কেঁদেছিল ছোট্ট রাকেশ। পুলিশের প্রতি বিতৃষ্ণা তার সেদিন থেকে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বড় হয়ে উচ্চশিক্ষিত হয়ে সে পুলিশকে দেখে নেবে। মা কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর ছেলের হাত তাঁর মাথায় দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলেন, রাকেশ নিজের হাতে কখনও অস্ত্র তুলবে না। আইন নিজের হাতে তুলে নেবে না। সেই প্রতিজ্ঞার জন্য নিজে সরাসরি মাওবাদের পথে না গিয়ে কয়েকটি মাওবাদী পরিবারকে সে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত।

মলি এটাই আমার অপরাধ। আমি খুন, ডাকাতি কিছুই করিনি। আমি চাই ওই পরিবারগুলির সন্তানরা সঠিক শিক্ষা পাক, খেয়ে পরে বাঁচুক। রাকেশের কথায় অভিভূত মালবিকা। সেই রাতে সে গুছিয়ে খাইয়েছিল রাকেশকে। সে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার শোবার ঘরে মশারি টাঙিয়ে দিয়েছিল রাকেশের জন্য। পাশের ঘরে বিছানা করে নিজে শুয়েছিল। সুগন্ধ সাবানের মতো এক অলৌকিক ভালোবাসার সুরভিতে সেই রাতে ভরপুর মালবিকা। তার মনে হচ্ছিল, একটি নদী তার যাত্রাপথে অনেক নতুন নতুন পথ পেরিয়ে আসে। পাহাড়, মালভূমি, সমতল, দিয়ে বইতে বইতে সেই নদী এখন এই বাঁকে এসেছে। এই নদীকে ভালোবাসতে হলে তার ফেলে আসা যাত্রা সমেত তাকে সে ভালোবাসবে। চিরদিন।

সাতটার অ্যালার্ম বাজছে। ধড়মড় করে উঠে পড়েছে মালবিকা। তার মনে পড়ে গিয়েছে গত রাতের কথা। তাড়াতাড়ি উঠে শোবার ঘরে গেল। দেখল শূন্য বিছানা। পাশের টেবিলে ছোট্ট একটা চিঠি।

মাই ডিয়ার মলি, আই লাভ ইউ। আই ডু নট উইশ উওমেন টু হ্যাভ পাওয়ার ওভার মেন, বাট ওভার দেমসেলভস। আমি চাই না নারীদের পুরুষের ওপর ক্ষমতা থাকুক। কিন্তু আমি চাই তাদের নিজেদের ওপর ক্ষমতা থাকুক। তোমার মধ্যে সেই ক্ষমতা দেখলাম। তোমাকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসেছি, চাইলেই এই ভালোবাসা থেকে সরে আসতে পারব না। কোনওদিন যেখানেই থাকি না। কিন্তু নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে আমি তোমাকে জড়াতে চাই না। ভালো থেকো।

রাকেশ।

কবিতা

প্রদীপের আলো জ্বলে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু একটু করে পেরিয়ে এসেছি
কত দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ
চলার পথের পাশে কখনও পেয়েছি দেখা
কোনও এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের
কখনও বা বই-মুখে-গোঁজা পণ্ডিত প্রৌঢ়ের
কখনও হঠাৎ দেখা কোনও পুরোনো বন্ধুর
কখনও বা আবির্ভূত পোড়-খাওয়া রাজনীতিবিদ
সহৃদয় পড়শিরা বলে কত কথা ব্যালকনি থেকে
কোনও চেনা দোকানদারের সহাস্যে কুশল নেওয়া
সব ধরা আছে মনের গ্যালারি জুড়ে সারি সারি
কখনও নিভৃতে জ্বলে মুখগুলো
যেমতো তুলসিতলায় প্রদীপের আলো।

দ্রিমিদ্রিম

মলয় গোস্বামী

ওগো সমূহ- বিভ্রম
ওগো রাজর্ষিদের পাড়া
ওগো পাড়াজ্বালানি মেয়ে
ওগো দরজায় তালা নাড়া
তুমি কি এমন করেই
বুকেই মাথা রাখবে?

আমার বুকের পৃথিবীতে
দুটো গাছ লাগালে হতো
হাওয়ায় পাতার বিধুনন
সংহত সংযত ।
জাগবে? তুমি জাগবে?

আরে ধ্যাৎ, সংযত না— ছাই
হঠাৎই বুকের ওপর পাই
দ্রিমিদ্রিম লাবডুবাডুব আসে
হিসহিস ভেতর- ঘরে হাসে

কবি কি সহ্য করতে পারে?

সন্ধ্যাবেলায় হাসছে দেখি চৌরাস্তার ধারে ...

গুঁড়ো গুঁড়ো অহংকার

সৌমিত বসু

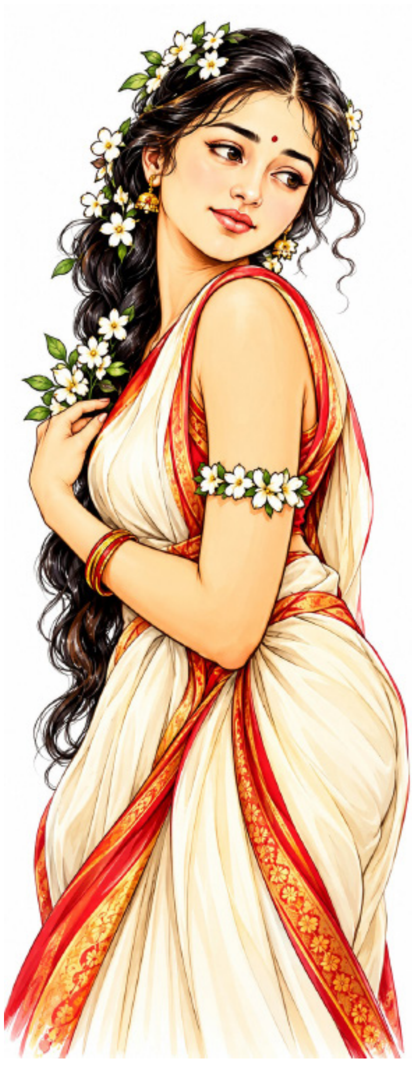

তোমাকে দেখলে জানো
পূর্ণতা মনে পড়ে যায়।

অনুষ্ঠান শেষ হলে
ঠিক কার কার ছবি ফেসবুকে দিতে হয়
সেটাও কিভাবে তুমি জেনে গেছো ।
এই জানাটুকু ছিলো না বলেই
কতজন তলিয়ে গিয়েছে
মঞ্চে তাদের কোনো ছাপ নেই।
তাদের সমস্ত লেখা আলগোছে শুয়ে
থাকে তাকের ওপর ।

ওই দেখো
কৃতজ্ঞতা কিভাবে যেন
বাড়িয়ে দিচ্ছে মুখ
আনুগত্যের পিঠের ওপর দিয়ে।

তোমায় দেখলে আজ শকুন্তলা মনে
পড়ে যায়।
যা কিছুর বিনিময়ে
শুধু দুষ্মন্তকে খুশি করা চাই
দূরে রেখে অনসূয়া প্রিয়ংবদা কে।

হে কন্যা
এই পথ ধরে একদিন কিভাবে যে তুমি
পৌঁছে যাবে সংসদ ভবনে
তুমিই জানোনা।

তোমার ছুমন্তর আঙুলের ছোঁয়ায়

নৃপেন চক্রবর্তী

তোমার ছুমন্তর আঙুলের ছোঁয়ায়
অনায়াসেই দারুচিনি ফুল ফোটে
সূর্য ডুবিয়ে মেঘ ভাঙে
বৃষ্টি হয়...
তোমার ছুমন্তর আঙুলের ছোঁয়ায়!

তুমি কি মেঘের সাথে
সারাদিন ঘুরেছো কখনো?
বৃষ্টির বিকেল গানে জলে ও জঙ্গলে...
তাঁহার মতন?

আমি তো তাঁহার সাথে
কতবার নদীটির ধারে...
ঘুরে ঘুরে মেঘ গন্ধ মেখে
হয়েছি শ্রাবণ...!

সব গাছ ছুঁয়ে থাকো...
দারুচিনি গাছের মতন
সব গাছ ছুঁয়ে থাকো তুমি
ফুটুক অজস্র ফুল...।

মেঘ ভাঙা বৃষ্টি মেখে না হয়
আবারও একটি বিকেল লেখা হোক
"শ্রাবণ ঘন ঘোর বরিষায়"...!

স্থায়ী অবসর

কেতকীপ্রসাদ রায়

এই যে চোখের ইশারায় আকাশ থেকে নামিয়ে
আনছ আলো,
নাকের গভীরে ঢুকিয়ে নিচ্ছো পরিশুদ্ধ বাতাস,
অতন্দ্র প্রহরীর মতো কানে প্রবেশ করাচ্ছ
বিসমিল্লাহর সানাই,
জেনে রেখো, এ সব কিন্তু তোমার নয়, সাময়িক
ব্যবহারের ছাড়পত্র।
এ সবের উপর যে কোনো দিন দিতে হতে পারে
দাদন।
দেবে নাই বা কেন-
কতো দিন আর নিঃশর্ত শুল্কে ভ্রমণ করবে বিশ্ব-
চরাচর!

অগ্রিম নিচ্ছ প্রয়োজন মতো নিঃশর্ত মৌ-স্বাক্ষরে;
নিচ্ছ...নাও;
তবে সময় আসলে দিতে হবে ষোলো আনার
দ্বিগুণ মাশুল।
ভয় হয়, কখন যে আলো নিভিয়ে দেবে আকাশ,
পরিশুদ্ধ বাতাস শেষ হয়ে যাবে জার শূণ্য করে,
বধির শাসনের মতো বোমাতঙ্কে কান নিয়ে যাবে
কাকে,
ভূপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে যাবে
কৃষ্ণগহ্বরে।
ভয় হয়, যে কোনো সময় বিশ্বস্ত চোখ কান নাক
পাড়ি দেবে ঘুমের দেশে;
আর এ সবের জন্যে দাদন ধার্য হলে নিশ্চিত নেমে
আসবে স্থায়ী অবসর।

যেতেই হবে

তাপস মহাপাত্র

রাস্তাটা অন্ধকার, তবু যেতেই হবে
ওখানে আরও এক যুদ্ধের অপেক্ষা

অন্ধকারের কোনো সীমা থাকে না,
তবু পেরোতে হবেই।
নিশ্চয়ই আলো আছে, দৃশ্যায়ন আছে
সেজন্যই তো অন্ধকার
তাই খিদে বাড়ছে চোখের, মনে মনে-
দৃশ্যের গন্ধও পাচ্ছি একটানা।

আপাতত যেদিকে পড়ছে পা সেদিকেই এগুনো
যুদ্ধ শুরুর আগে এই রাস্তা আমাকে পেরোতেই হবে....

বুকের মধ্যে রঙ চড়াচ্ছে গন্তব্যের ছবি
যেন আশ্বিনের পাড়ায় ঢুলছে ঘুমঘুম শরৎ
ঢেউ খেলছে কাশের ঝোপ, বিপুল-
অন্ধকারের ভিতর কোথাও যেন আগমনীর সুর।
মণ্ডপের শোরগোল, নতুন জামার মতো-
গায়ে লাগছে শিশিরের আস্তরণ,
তার মধ্যে যেন বহুযুগের পুরোনো নামে ডাকছে কেউ
শুনতে শুনতে এগোচ্ছি, খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলেছি
যুদ্ধের আগেই আমাকে তাবৎ অন্ধকার পেরোতেই হবে।

বুকের মধ্যে লক লক করছে শালুক ডাটার মতো নির্ভয়
এই অন্ধকার যে বহুকাল অজাতশত্রুর মতো, নির্ভিক
এতক্ষণে বুঝে গেছি তাও।
তাই সাহসের সঙ্গে শিখে নিচ্ছি স্তব্ধতার অভিশ্রুতি
হয়তো তা যুদ্ধের অস্ত্র হতে পারে, তার আগে-
এই অন্ধকার আমাকে পেরোতেই হবে,
তার আগে যুদ্ধ জয়ের বাল্যকাল আমাকে চিনে নিতে হবে।

যে কোনো অন্ধকার পেরোলেই নতুন যুদ্ধের উদ্বোধন!

খানা-হরকরা
আর্যতীর্থ

ছোটো হে জোমাটো-ছেলে, জেপটো-
তরুণ,
ভোর থেকে মাঝরাত ,
দরকারে তারও পরে,
কত লোক খিদে চেপে বসে আছে,
রান্না চাপেনি কত ঘরে,
মেটাও তাদের খিদে,
শান্তি ফিরুক সব পাকস্থলীতে তোমার
দরুন,
অতঃপর,
সব ডেলিভারি করে,
ঘাম মুছে ক্লান্ত বাইকে ফেরো ঘর
রাতে কী কী হয়েছে সেখানে?
জুড়ানো ভাত, শক্ত হওয়া রুটি, ডাল,
তরকারি..
তার বেশি দিতে পারে বাড়ি?

সারাদিন ঠিকানা খুঁজতে খেটে খেটে,
কতটা রেজকি এলো আজকে পকেটে?
ছোটো হে খানা-হরকরা, দেখো কার
ডাক এলো ইন্টারনেটে।

কী পাশ করেছো তুমি কোন স্কুল থেকে?
বাইকে বোঝা'র চাপে পিঠ গেছে বেঁকে,
ম্যাপে দেওয়া ঠিকানার দিকে যেতে যেতে,
কখনো কি ছুঁয়ে যাও ছেলেবেলা,
কৈশোর যেই মাঠে আছে কোল পেতে,
সেখানে কখনো গেলে দুমিনিট বাষ্পনজরে
দেখো কি অচেনা কিশোর কোনো বল নিয়ে গোলমুখে ঘোরে,

তুমি যেরকম ছিলে ক'বছর আগে?
নাকি সেটুক সুখও লেখা নেই ভাগে,
'ভাগো ভাগো' চিল্লায় তোমার মনিব অ্যাপ,
ইটিএ দেখায় যত ফোনের গুগল ম্যাপ,
তারও আগে করা চাই ডেলিভারি..
বাইকের স্পিড বাড়ে,
স্কুলের খেলার মাঠ,
পাড়াতুতো কাকু-মাসি, বন্ধুর বাড়ি,
সব কিছু পাশে ও পেছনে ফেলে তড়িঘড়ি বামাল
দাঁড়াতে হবে সে বাড়ির গেটে,
যেখানে ওটিপি রয়েছে অপেক্ষা করে।
নম্বর কাটা যাবে লেট-এ..

ছোটো হে নব্য-রানার, জি পি এস অন করে ইন্টারনেটে..

প্রেমিকা কি আছে কেউ? কিংবা প্রেমিক?
রুটিনে নিরন্তর ঘড়ি-টিকটিক,
অবসরে অবসাদ ঘুম টেনে আনে,
জুড়ানোর মন খুঁজে পেলে কোনোখানে?
হরকরা-জীবনে প্রেম-ছোঁয়া ভয়ানক বিরল ঘটনা,
তার ওপরে পকেটেও রেস্ত অত না,
টগবগে যৌবন তবে কি ফুরাবে শুধু
পিঠে বোঝা নিয়ে চড়ে বাইকের পিঠে?
কে সাথী হতে যাবে উন্নতি যে পেশায় নেই ফোঁটাছিটে?

বাড়িতে কে কে আছে?
মা বাবা দাদা ভাই বোন..
তাদের কি ভালো লাগে গোটাদিন বাইকযাপন?
তাদের ইচ্ছে ছাড়ো,
তোমারও কি ভালো লাগে খাটা এই ফোন-খিদমত?
অথচ খিদের জ্বালা মেটাবার নেই আর পথ,
অন্তত বেকার তো নও,

পিঠে বয়ে পেটে খায়,
জন-অরণ্যের এটা নতুন প্রবাদ,
একপেশে জিডিপির তিতকুটে স্বাদ,
নিরানব্বই করে দৈনিক ভাতের জোগাড়,
একভাগ পুরো গুড় খেয়ে চলে চেটে।

ছোটো হে জোমাটো-তরুণ, জেপটো-যুবক,
যৌবন কেটে যাক পিঠে বোঝা সেঁটে।

জি ডি পি'তে স্বদেশ আজ প্রথম সারিতে,
ঘাম মুছে হেসে দেখো ইন্টারনেটে।

জল- যুবতীর ব্যস্ত সাঁতার -প্রেমে

অসীম দাস

আজকে থামাও ব্যস্ত পায়ের ঢেউ
ইতস্তত করো না মাঝ নদী,
শরৎ - গন্ধ তোমার ভিতর ঘুমে
জাগাবো সৎ সম্মতি দাও যদি।

একটি সন্ধ্যা চাইছি নোঙর -চোখ
তোমার দৃষ্টি আমার সেতু হোক,
অন্ত্যমিলও পিছলে বেহিসেবী
যেখানে যাও, ঝোলাবো প্রেম -জোঁক।

তার 'চে বরং মুগ্ধ এসো কূলে
কাটলে সাঁতার জল- যুবতী তুমি ,
তোমার নাড়ীর আলোর অন্ধকারে
জলের নীচে খিদের গোপন ভূমি।

গোপন আরও গহীন মনের তলে
সাধ ফোটাবো, সাধ্যে রেখো সুর
শরীর জুড়ে শিউলি শিশির ছায়ায়
আর কারও নয়, তোমার-ই রোদ্দুর...

বিলাপ

সুবীর সরকার

দ্বিখণ্ডিত নদীগুলি দেখে কিছুই ভালো লাগে না।
ছুঁড়ে দিই তামার পয়সা
ফাঁদ পেতেছে ফান্দি ভাই
অথচ শূন্য খাঁচা,গানের মধ্যে বিলাপ
কিছুতেই ঘরে ফেরা হয় না
রং করা জানালায় পাখিদের ছায়া
শূন্য পাতায় বৃক্ষ আঁকি, নদী ও নারী
আঁকি।

বাঁদর ও মাদারি

গৌরব চক্রবর্তী

গলাতে বাঁদরের
মোতির মালা দিলে
হাতে ধরিয়ে দিলে তরবারি
এবারে মাছি যদি
তোমার নাকে বসে
বাঁদরকে ঠেকাতে আমি পারি?

আমিও দূর থেকে
খেলাটা দেখে যাই
কিচ্ছু বলছি না বন্ধ মুখ
যে যার আয়তনে
নিজেকে মেলে ধরে
আমিও দেখি কত বাড়ে, বাড়ুক

তোমাকে বড় বেশি
ভক্তি করে গেছি
হাসছে দেখো স্থিতি-সৃষ্টি-লয়

তোমার কলকাঠি
বাঁদর ধরে আছে
তোমাকে টান দিলে নাচতে হয়

এতটা বয়সেও
মানুষ চিনলে না
কাছের ছিল কারা, কারা যে পর
সময় চিরকাল
সমান নাহি যায়
আগুনে হাওয়া দিলে পুড়বে ঘর

ছিলাম, আজও আছি
পরেও থেকে যাব
ফিরতে হবে ঠিক শেষবেলা
এখন আপাতত
বেশ তো জমে গেছে
বাঁদর-মাদারির এই খেলা

বিশেষ রচনা

সকলের দুর্গা হতে নেই

সঞ্চয়িতা ঘোষ (সেন)

যতদিন অসুর দলনী না হওয়া যায়, ততদিন কি তাহলে দুর্গা হওয়া যায় না? ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, বাজপেয়ী সংসদে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে “মা দুর্গা” বলে অভিহিত করেছিলেন। অনেকেই গোটা বিষয়টাকে রাজনীতির রূপকথার জনপ্রিয় স্লোগান বলে যদিও। কিন্তু সমাজ মাধ্যমে প্রচারিত এই বক্তব্যই মাথায় ঘুরছিল শর্বরীর।

শরতের আকাশে এখন বর্ষার মেঘ। শিউলিগুলিও ফুটতে ভরসা পাচ্ছে না ঠিক। পুজো এখনও বাকি বেশ কয়েক দিন। বিয়ের আগে হলে এতদিনে পটুয়া পাড়ায় ঢুঁ মারা হয়ে যেত। বিয়ের আগে হলে বাবার সঙ্গে সাংবিধানিক আর্গুমেন্ট করে পছন্দের জামা কেনা হয়ে যেত এতদিন। এখন তো সময় বদলেছে। ক্যালেন্ডার বলছে শরৎ কাল, অথচ আকাশে সাদা মেঘই ওড়েনি। বাষ্প কাটেনি শর্বরীর মনেও।

বাংলায় এম এ পাশ করার পর নাচটাকেই জীবন বানাতে চেয়েছিল। দু পায়ে প্রায় ২৫০ টির মত ঘুঙুর এক সঙ্গে যখন বাজত, তখন নটরাজের সামনে নিজেকে দুর্গা ই মনে করত শর্বরী। তখন অক্ষয় কুমারের খিলাড়ি সিরিজের যে কোনও সিনেমাই ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার সময় পেত। তখন গোটা দিন ঘরে তাইরে নাইরে করার পরও কেউ বলত না 'সারাদিন ঘরে বসে কী কর'?

আকাশের মেঘটা কিছুক্ষণ আগেও হাতি সেজেছিল। এখন অনেকটা লাফিং বুদ্ধা। ছাই রঙের বুদ্ধ। কিছুক্ষণ আগেই এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। চোখ লেগে গিয়েছিল, জামা-কাপড় সব ভিজেছে ছাদেই। নাগচাঁপার কুঁড়ি দুটোও ভিজেছে। ঝুরো বৃষ্টি যখন আটকায় খোপা না করা খোলা চুলে, তখন মনে হয় অনেক বছর আগে এমন ভাবেই কেউ চুলে বিলি কেটে দিত। এখন সে সবই অতীত, পাঁচতারা মল গোটাটাই শুধু দায়িত্ব আর ব্যর্থতা।

দুর্গা হতে চেয়েছিল শর্বরী। কিন্তু যারা কাপড় শোকাতে ছাদে এসে নিজের জন্য সময় চুরি করে, যারা হঠাৎ রবি ঠাকুরের গান গেয়ে ফেলে নিজের অজান্তে, যারা বিগবসের ঘরে ঝিলমকে নিয়ে নিজে নিজেই কথা বলে, তারা বোধহয় দুর্গা হতে পারে না।

শর্বরীর বড় বংশে বিয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। শিক্ষিত মার্জিত পরিবার, পয়সার অভাব ছিল না কোনও দিনই। এখনও অচিন্তকে রাগের মাথায় দুটো কথা বলে দিলে খুব একটা রিঅ্যাক্ট করে না। কিন্তু তবুও কেন যে মনে বার বার অভিমানের বাষ্প জমা হয়? মনে হয় অচিন্তর থেকে তাকে বেশি বোঝে পাড়ার মোড়ের ফুচকা ওয়ালাটা।

আপতত সূর্য, মেঘের আড়াল থেকেই অস্ত যাবার তোরজোড় করছে। ছেলেটার হয়েছে কুম্ভকর্নের মত ঘুম । সহজে ঘুম আসে না, একবার এলে ছাড়ে না। শর্বরীর কাছে দুটো অপসন ছিল। হয় একটু গা এলিয়ে দেওয়া এই সুযোগে, নয়তো যেটা সে এখন করছে।

শর্বরীদের ছাদে মোটামুটি ভাবে ফুটবল খেলা যাবে। পুরানো বাড়ি। ছাদ সাজানো তার নিজের মত করে। ফল গাছ, ফুল গাছ, কিছু গাছ তার পাতার জন্যই সুন্দর। এরাও শর্বরীকে বোঝে। পাশের বাড়িতে দোতলার পিলার গাঁথার কাজ চলছে। ছেলেটার বোধহয় বিয়ে হবে। তাই ঘর বাড়ানো। ছাদের কোণায় রাখা বালতির জলে নিজের সিমেন্ট মাখা হাতটা ধুচ্ছে এক মহিলা। আট ঘণ্টার সিফট শেষে, তার পকেটে রয়েছে হয়তো সাত দিনের বাজার, অথবা মেয়ের জন্য একটা সস্তা ফ্রক কেনার পয়সা।

আচ্ছা ওই মহিলা দুর্গা হতে পারবে কোনও দিনও। শর্বরীর দুই ননদ স্কুল টিচার। দেখা হলেই গাল টিপে আদর করে শর্বরীর। জন্মদিনে আশীর্বাদ করে। দশ হাতে সবকিছু সামলায়। গোপালদের বাড়ির ছাদে কাজ করা ওই মহিলার দশ হাত নেই বোধহয়। কোথাও যেন শর্বরী আর ওই মহিলা এক হয়ে যায় খোলা আকাশের নীচে।

একতলা থেকে টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে। তার মানে ছেলে জেগে গিয়েছে। এবার শর্বরী ছাদ থেকে নামবে। ছেলেকে নিয়ে যাবে টেবল টেনিস ক্লাসে। মোড়ের মাথায় টোটো পাওয়া যায় না সবসময়। হাঁটুতে বেশ ব্যথা। বাজার পর্যন্ত হাঁটতে হতে পারে, তাই সময় হাতে নিয়ে বেড়োতে হবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অচিন্তও চলে আসবে। দুধ আছে তো? ডাক্তার বার বার বলেছে দুধ ছাড়া চা খেতে, কে শোনে কার কথা। অচিন্ত রাতে বলেছিল পনীর খাবে। ফেরার সময় স্টেশনের দোকানটা থেকে কিনে আনতে হবে।

সামনের ছাদে রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজ করা মহিলা এর মধ্যে কাপড় বদলে ফেলেছে। বাড়ি যাবার পথে বাজার যাবে বোধহয়। টেপা বোতাম মোবাইলে বেশ জোরে জোরেই কাকে যেন বলছিল। বর হবে বোধহয়। মুখে হাসি। কিছু পাওয়ার হাসি, অথবা কিছু আঁকড়ে ধরার হাসি।

ছাদ থেকে নামবে দুজনেই। দুজনের আশ্বিনেই বর্ষার মেঘ কাটেনি এখনও। তাদের জীবনে কখনও আশ্বিন আসবে? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করল শর্বরী। মাথার সামনে কয়েকটা চুল রুপোর মত চিকচিক করছে। সকলের দুর্গা হওয়া হয় না। সকলের দুর্গা হতে নেই। কেউ থাকুক ধরিত্রী হয়ে। সবকিছুর ভার বুকে নিয়ে, নিজের উপস্থিতি জানান দিক নাগচাপা ফুলের গন্ধের মত।

বড়গল্প

সিকিয়াঝোরার বুনো হাঁস

নমিতা দাশ

নভেম্বর মাস, সবে শীতের আমেজ আসতে শুরু করেছে এই সময় উত্তরবঙ্গ কবিতা উৎসবে কোচবিহার যাওয়ার মজাই আলাদা। সংগঠনের কাজ, কবিতা, আবৃত্তি, গান আর নাটকে ভরপুর একটি আদ্যোপান্ত সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করে এবার উৎসাহই আলাদা। সংগঠনের অনেকে একসাথে এবারে এসেছেন তিনদিনের এই উৎসবে যোগ দিতে। অনেকেই এই বছর প্রথম এসেছেন কোচবিহারে, তাই বেড়ানোর পরিকল্পনা আছেই। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠান শুরুর পরেই ঐশিরা বেশ কয়েকজন মিলে গাড়ি করে চলল সিকিয়াঝোরার পথে। কোচবিহার শহর ছাড়িয়ে ওদের গাড়ি যখন জঙ্গলের পথ ধরলো তখন যেন প্রকৃতি এক সবুজ সম্ভার নিয়ে যেন ওদের জন্য অপেক্ষমান। সদ্য বর্ষার রেশ চলে গেছে, চারিদিকে জঙ্গলের গাছপালাগুলো যেন প্রেমের তুফানে ভাসছে। হাল্কা একটা শীতের আমেজ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি আর ঘন জঙ্গলে খসখস আওয়াজে সবার মনে

কত শত কবিতার জন্ম নিচ্ছে। পিয়া হঠাৎ করেই গাইতে শুরু করলো, জানা অজানা পথে এসেছি.........সাথে সাথে অপর্ণা আর সঙ্গীতাও গলা মেলালো। এভাবে অনেকটা পথ পেরিয়ে যখন ঐশিরা সিকিয়াঝোরার গেটের কাছে এসে নামলো তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। সিকিয়াঝোরার বোটিং এর জন্য ছয়শ টাকা দিয়ে টিকিট কাটার পর ভেতরে ঢুকেই দেখলো ফুলের সম্ভার আর একটা সুন্দর ঝোরা। সেই ঝোরার ওপর একটা ছোট্ট সুন্দর ব্রীজ। এখানকার সৌন্দর্য কে ক্যামেরাবন্দী করতে সবাই ইতস্ততভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বর্ষার পর বলে ঝোরায় বেশ জল আছে। তারপর সবাই মিলে ধীরে ধীরে ওখানে রাখা একটি নৌকায় উঠে পড়ল। নৌকায় পা দিতেই সায়নির একটি পাটাতনে পা পড়ে। সায়নি প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। নৌকার মাঝি সাবধান করে বললো ওখানে ভাঙা আছে। যাই হোক ওই জায়গাটা ছেড়েই সবাই বসল। নৌকা একটা ছোট সরু জলপথে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো। এইখান দিয়ে যেতে যেতে ঐশির কেরালার ব্যাক ওয়াটারের কথা মনে হচ্ছিল। কিছুদিন আগেই কেরালা ঘুরে এসেছে ও। প্রকৃতির একই বৈচিত্র্য ভারতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসে মিশেছে। দুদিকে ঘন জঙ্গলে কোথাও ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, তো কোথাও খসখস করে বন্যপ্রাণীর চলে যাওয়ার আওয়াজ, আর কোথাও পাখির কিচির মিচির যেন সব নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে। ওই জলপথে কচুরিপানা আর শালুকের বিভিন্ন ভ্যারাইটি তাদের ফুলের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সায়নি নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে জলের মধ্যে ফুল তুলতে গিয়েছিল। পা দুটোকে সামনের দিকে টো এর ওপর ভর দিতেই স্নিকারের পেছনে লাল কিছু লেগে থাকতে দেখলো ঐশি। কি লাগলো? রক্ত? সে রকমই তো মনে হলো ঐশির। ঐশি নৌকার পাটাতনে তাকিয়ে দেখে একটু শুকনো রক্তের দাগ। যে ভাঙা জায়গায় পা পড়েছিল সেইখানেও একই দাগ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করতেই মাঝি খুব স্বাভাবিকভাবে বলে বুনো হাঁস ম্যাডাম। বুনো হাঁস মেরেছিল আপনাদের আগে যারা এসেছিল, ওটা তারই দাগ। আমি নৌকা ধুয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু একটু হয়তো রয়ে গেছে। এই নিয়ে কাকলি বলতে থাকে এখানে বুনো হাঁস মেরেছে, তোমরা কিছু বললে না? কি বলবো, ওরা সব.. বোঝেনই তো!

অপর্ণা আর সঙ্গীতার অনুরোধে পিয়া সবে গান ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটি বন্যপ্রাণী হত্যার খবরে সবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের নৌকাটা অনেকটা যাবার পর মাঝি একটা বোর্ড দেখিয়ে বললো, আর যাওয়া যাবে না। বন দফতরের তরফ থেকে একটা বোর্ডে সতর্ক করা হচ্ছে, এর পর জঙ্গল আরো ঘন হচ্ছে আর হিংস্র বন্যপ্রাণীর বিচরণের জন্য আর এগোনো যাবে না। কিন্তু নৌকার মাঝি বলে যে দুশ টাকা দিলে আরো কিছুটা ও যেতে পারে। দিনের বেলায় কোনো হিংস্র প্রানী এদিকে আসে না। ঐশি, সায়নি, পিয়া, অপর্ণা, সঙ্গীতা আর রুদ্র এই ছয়জনই একবাক্যে মাঝির প্রস্তাবে সম্মত হল। কিছুটা

যেতেই রুদ্র একটা গাছের ওপর গোসাপ দেখতে পেয়ে সবাইকে দেখাল। আরোও খানিকটা যেতেই হাতির পায়ের ছাপ ও হাতির বিষ্ঠা দেখতে পেল ওরা। যত এগোচ্ছিল জঙ্গল তত ঘন হচ্ছিল আর ওই ঝোরার জলে কচুরিপানা আর বিভিন্ন প্রজাতির শালুক ফুলে জলের ধারা ভর্তি ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল এইদিকে নৌকার যাতাযাত বেশ কম। একটা জায়গায় নদীপথ পুরো কচুরিপানায় ভর্তি, সেখান থেকে নৌকা ঘোরায় মাঝি। ঐশি বলে, মাঝিভাই আর একটু চলো। মাঝি রাজি হয় না, বলে আর যাওয়া যাবে না। ঐশি বলে, কেন আগের ট্রিপে তো আরো খানিকটা গিয়েছিলে, বুনো হাঁস ধরতে। মাঝি বলে, না না আমি আর যাবো না। ঐশি কচুরিপানার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সদ্য সদ্য এই কচুরিপানাকে তোলপাড় করে নৌকা গেছে। এদিকটাতে নদীর ধারে একটু যেন জঙ্গলের ঘনত্ব কম। আরো না হয় দুশ টাকা দেবো, আর একটু চলো, সায়নির গলায় আবদারের সুর। কিন্তু মাঝি কোনো কথা না বলে নৌকা দ্রুত ঘোরায়। মাঝির ওরকম তাড়া দেখে ঐশির মনে সন্দেহ জাগে। ঘাটে এসে নৌকা থামলে ঐশি নৌকার ভাঙা পাটাতনে ইচ্ছে করে পা রাখে। যথারীতি পা ভেতরে ঢুকে যায়। সবাই হাত ধরে ওকে তোলে। কিন্তু ঐশির মনের সন্দেহ দৃঢ় হয়। তাহলে সায়নির স্নিকারে আর ঐশির স্নিকারে রক্তই লেগেছে। কিসের রক্ত? বুনো হাঁসের? এই সিকিয়াঝোরায় তাহলে চোরাশিকারীর অবাধ বিচরণ! রুদ্র মাঝিকে দুশ টাকা দেবার জন্য পাঁচশ টাকার নোট বার করে। খুচরো দেবার জন্য মাঝি যে নোটের বান্ডিল বার করে সেটা ঐশির চোখ এড়ায় না। এত্তো নোটের বান্ডিল এই মাঝির কাছে! সবে মাত্র দুপুর বারোটা!

তাহলে কি গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে সিকিয়াঝোরার জঙ্গলে? বিষয়টা ভাবাচ্ছে ঐশিকে!

দ্বিতীয় পর্ব

ঘাটে ফিরে এসেও ঐশির মাথা থেকে ব্যাপারটা কিছুতেই বের হচ্ছিল না।

নৌকার পাটাতনে শুকনো রক্তের দাগ।

সায়নির জুতোর পেছনে লেগে থাকা রক্ত।

মাঝির অস্বাভাবিক তাড়া।

আর সেই মোটা টাকার বান্ডিল!

সবকিছুকে একসঙ্গে জুড়তে গেলেই যেন একটা অদৃশ্য দরজা খুলে যাচ্ছে। কিন্তু দরজার ওপারে কী আছে, সেটা কিছুতেই দেখা যাচ্ছে না।

— কী ভাবছিস এত? পিয়া জিজ্ঞেস করল।

ঐশি হেসে বলল— কিছু না। এই জায়গাটা খুব সুন্দর, অথচ কোথাও যেন একটা অস্বস্তি আছে।

কাকলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল— তুই আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করিস না যেন!

সবাই হেসে উঠল। শুধু ঐশি হাসল না।

তার চোখ তখনও ঘাটের দিকে।

মাঝিটা নৌকা বাঁধার পর কোথায় যেন চলে গেছে। একটু আগেও যে লোকটা ওদের সঙ্গে এত কথা বলছিল, এখন তার কোনো চিহ্ন নেই।

রুদ্র বলল— চল, আর একটু ঘুরে দেখি। তারপর শহরে ফিরতে হবে। অনুষ্ঠানও আছে।

সবাই এগিয়ে গেল।

ঐশি পিছিয়ে রইল।

ঘাটের পাশে একটা কাঠের খুঁটিতে চোখ পড়তেই সে থমকে গেল।

খুঁটির গায়ে খুব হালকা করে খোদাই করা কয়েকটি অক্ষর—

“S-17”

ঐশি হাত দিয়ে অক্ষরগুলো ছুঁয়ে দেখল।

এটা কি কোনো নৌকার নম্বর?

নাকি অন্য কিছু?

— ঐশি! চল!

সায়নির ডাকে সে চমকে উঠে সবার সঙ্গে এগিয়ে গেল।

ফিরতি পথে গাড়িতে সবাই বেশ চুপচাপ

কোচবিহারের দিকে রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটছে। জানলার বাইরে সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে।

হঠাৎ সায়নি বলল,

— একটা কথা বলব? আজ নৌকায় আমার পা যেখানে ঢুকে গিয়েছিল, সেখানে কিন্তু শুধু রক্ত ছিল না।

ঐশি তৎক্ষণাৎ ঘুরে তাকাল।

— কী ছিল?

— ঠিক বুঝিনি। কালচে একটা পালকের মতো কিছু আটকে ছিল। আমি ভেবেছিলাম শালুকের শুকনো পাতা।

— পালক?

সায়নি মাথা নাড়ল।

ঐশির বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

— তুই সেটা ফেলেছিস?

— হ্যাঁ। নৌকা থেকে জলে ফেলে দিয়েছিলাম।

ঐশি আর কিছু বলল না।

কিন্তু তার মনে হলো, ব্যাপারটা শুধু বুনো হাঁস শিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সেদিন রাতেই উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ঐশি নিজের ঘরে ফিরে মোবাইলটা হাতে নিল।

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সে ইন্টারনেটে খুঁজতে শুরু করল—

"সিকিয়াঝোরা বুনো হাঁস শিকার"

প্রথম কয়েকটা ফলাফলে বিশেষ কিছু পেল না।

তারপর একটা পুরোনো সংবাদ প্রতিবেদন চোখে পড়ল।

খবরটি প্রায় এক বছরের পুরোনো।

শিরোনামটা পড়েই ঐশির বুক ধক করে উঠল—

"সিকিয়াঝোরা জঙ্গলে বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের সন্দেহ, তদন্তে বন দফতর।"

খবরটা খুলে পড়তে গিয়ে সে জানতে পারল, কয়েক মাস আগে ওই অঞ্চলে অবৈধভাবে শিকার করা কিছু পরিযায়ী পাখি উদ্ধার হয়েছিল।

কিন্তু খবরের শেষের একটি লাইন তার চোখ আটকে দিল।

"তদন্তকারীদের ধারণা, শিকারিরা শুধুমাত্র পাখি শিকার করছে না; জঙ্গলের ভেতরে তাদের আরও বড় কোনো নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকতে পারে।"

ঐশি কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে বসে রইল।

ঠিক তখনই তার ফোনে একটা মেসেজ এল।

অচেনা নম্বর।

মাত্র তিনটি শব্দ—

"সব দেখেছেন আপনি।"

ঐশির হাত ঠান্ডা হয়ে গেল।

সে কিছুক্ষণ মেসেজটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর লিখল—

"আপনি কে?"

কোনো উত্তর এল না।

এক মিনিট।

দুই মিনিট।

তারপর আবার একটা মেসেজ।

“কাল সিকিয়াঝোরায় যাবেন না।”

ঐশির বুকের ভেতর ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল।

সে সঙ্গে সঙ্গে সায়নিকে ফোন করল।

ফোন ধরল না

পিয়াকে করল।

সেও ধরল না।

অপর্ণাকে ফোন করল।

তৃতীয় পর্ব

অপর্ণার ফোনও বেজে বেজে থেমে গেল।

ঐশি এবার সত্যিই অস্বস্তি বোধ করল।

ঘড়ির দিকে তাকাল— রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

আবার সেই অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ এল।

“কাউকে ফোন করবেন না। বিশেষ করে যাকে মাঝি বলেছিলেন।”

ঐশির বুকের মধ্যে যেন কেউ বরফ ঢেলে দিল।

সে সঙ্গে সঙ্গে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল।

উৎসবের থাকার জায়গাটার সামনের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দূরে একটা স্ট্রিটলাইটের নিচে দুটো কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। তার বাইরে অন্ধকার।

হঠাৎ—

একটা ছায়া রাস্তার ওপারে নড়ল।

ঐশি চোখ কুঁচকে তাকাল।

কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে।

কালো চাদর বা জ্যাকেটের মতো কিছু পরা। মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

ঐশি একটু এগিয়ে জানলার কাচের কাছে যেতেই লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ঐশির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

ঠিক তখন দরজায় টোকা।

ঠক**...** ঠক**...** ঠক**...**

—কে?

কোনো উত্তর নেই।

আবার টোকা।

এবার একটু জোরে।

ঐশি দরজার কাছে গিয়ে পিপহোল দিয়ে তাকাল।

কেউ নেই।

দরজা খুলবে কি না ভাবছে, এমন সময় মেঝের নিচ দিয়ে যেন একটা কাগজ ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

ঐশি চমকে পিছিয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পর সাহস করে দরজা খুলল।

করিডোর ফাঁকা।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা ছোট্ট বাদামি খাম।

খামের ওপর শুধু লেখা—

ঐশির জন্য।

হাত কাঁপতে কাঁপতে খামটা খুলল সে।

ভেতরে একটা ছবি।

ছবিটা দেখে ঐশির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

ছবিতে দিনের বেলা দেখা সেই নৌকাটা।

কিন্তু ছবিটা তোলা হয়েছে জঙ্গলের অনেক গভীর থেকে।

নৌকার মধ্যে ছয়জন বসে আছে।

ঐশি, সায়নি, পিয়া, অপর্ণা, সঙ্গীতা আর রুদ্র।

অর্থাৎ—

আজকের ওদের নৌকাভ্রমণ কেউ একজন দূর থেকে ছবি তুলেছে।

ছবির পেছনে হাতে লেখা আরও একটি বাক্য—

“আপনারা ছয়জন ছিলেন। কিন্তু নৌকায় উঠেছিল সাতজনের ছায়া।”

ঐশি ছবিটা আবার উল্টে দেখল।

ছবিতে সত্যিই নৌকার পেছনের জলে একটা অদ্ভুত ছায়া দেখা যাচ্ছে।

ছায়াটা যেন একজন মানুষের।

কিন্তু নৌকায় তো কেউ ছিল না!

নাকি ছিল?

পরদিন সকাল।

ঐশি সারারাত ঘুমোতে পারেনি।

ভোরে পিয়া এসে দরজা খুলতেই দেখল ঐশি বিছানায় বসে আছে।

— তুই ঘুমাসনি?

ঐশি কোনো উত্তর না দিয়ে ছবিটা পিয়ার হাতে দিল।

ছবিটা দেখেই পিয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

— এটা কী?

— কাল রাতে আমার ঘরের দরজার সামনে পেয়েছি।

— কে দিয়েছে?

— জানি না

পিয়া কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ বলল,

— ঐশি... এই ছবিটা একটু জুম কর।

মোবাইলে ছবিটা তুলে জুম করতেই দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

নৌকার ঠিক পেছনে জলের ধারে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু তার হাতে কী যেন একটা লম্বা জিনিস।

রাইফেল?

নাকি বন্দুক

ঐশি ফিসফিস করে বলল,

— তাহলে আমাদের নৌকাটা শুধু অনুসরণ করা হয়নি... আমাদের পাহারা দেওয়া হচ্ছিল।

পিয়া এবার বলল,

— কিন্তু কেন?

ঐশি উত্তর দেওয়ার আগেই বাইরে থেকে সায়নির গলা ভেসে এল—

— তোমরা দুজন এখানে কী করছ? তাড়াতাড়ি বেরো! একটা খবর আছে।

দুজন বাইরে বেরিয়ে এল।

সায়নির হাতে একটা স্থানীয় পত্রিকা।

প্রথম পাতার নিচে ছোট্ট খবর—

“সিকিয়াঝোরা সংলগ্ন জঙ্গলে বনকর্মীদের তল্লাশি। সন্দেহজনক নৌকা চলাচলের খোঁজ।”

ঐশি খবরটা পড়ছিল, এমন সময় সায়নি বলল,

— শুধু এটুকুই নয়। ভেতরের পাতায় আরও একটা খবর আছে।

পাতাটা খুলে দেখাল সে।

খবরের সঙ্গে একটা ছবি।

ছবিটা দেখে ঐশির মাথা ঘুরে গেল।

ছবিতে যে লোকটা ছিল—

সে-ই গতকাল ওদের নৌকার মাঝি।

খবরের নিচে লেখা—

“বন দফতরের নজরদারিতে থাকা এক সন্দেহভাজন নৌকাচালক গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ।”

ঐশি ধীরে ধীরে পিয়ার দিকে তাকাল

— কিন্তু... আমরা তো গতকাল ওর সঙ্গেই নৌকায় গিয়েছি!

কেউ কোনো কথা বলল না।

ঠিক তখন ঐশির ফোনে আবার মেসেজ এল।

এবার মাত্র একটি লাইন—

“মাঝি নিখোঁজ হয়নি। সে আজও সিকিয়াঝোরায় আছে।”

তার নিচে আরেকটি ছবি।

ছবিটা দেখে ঐশির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

ছবিতে সিকিয়াঝোরার সেই ঘন জঙ্গল।

আর জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে—

ওদের গতকালের নৌকাটা।

কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার—

নৌকার ভাঙা পাটাতনটা এবার সম্পূর্ণ নতুন।

আর নৌকার ওপর রাখা আছে ছয় জোড়া জুতো।

ঐশি নিজের পায়ের দিকে তাকাল।

তার স্নিকার জোড়া তো তার কাছেই!

তাহলে ছবির নৌকায় রাখা ছয় জোড়া জুতো কার?

ঐশির মনে হলো, সিকিয়াঝোরার জঙ্গল যেন দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।

আর কোথাও খুব গভীরে—

একটা বুনো হাঁস হঠাৎ ডেকে উঠল।

“ক্যাক... ক্যাক...”

তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

কিন্তু এবার সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐশি স্পষ্ট শুনতে পেল—

কেউ একজন ফিসফিস করে বলছে—

“তোমরা আবার আসবে...”

চতুর্থ পর্ব

"তোমরা আবার আসবে..."

কথাটা কানে আসতেই ঐশি হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল। কেউ নেই।

পিয়া, সায়নি, রুদ্র— সবাই তখন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগেও যেন খুব কাছে থেকেই কেউ কথাটা বলেছিল।

— তোরা শুনলি? ঐশি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

— কী?

— কেউ যেন বলল, আমরা আবার আসব।

পিয়া একটু বিরক্ত হয়েই বলল,

— তুই কাল রাত থেকে এত কিছু দেখছিস যে এখন কানে কানে কথাও শুনতে শুরু করেছিস!

ঐশি আর কিছু বলল না।

কিন্তু তার চোখ চলে গেল সায়নির পায়ের দিকে।

সায়নির সেই স্নিকার জোড়া নেই।

— তোর জুতো কোথায়?

সায়নি অবাক হয়ে বলল,

— কোনটা?

— কাল যেটা পরেছিলি।

— ধুয়ে ফেলেছি। কেন?

ঐশি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

— কোথায়?

— হোটেলের বাইরে জলের কলের কাছে।

ঐশি আর এক মুহূর্তও দেরি করল না।

জলের কলের কাছে গিয়ে দেখা গেল স্নিকার দুটো নেই।

সায়নি চারদিকে তাকিয়ে বলল,

— আরে! এখানেই তো রেখেছিলাম!

রুদ্র নিচু হয়ে মাটির দিকে তাকাল।

— এখানে কেউ এসেছে। ভেজা মাটিতে জুতোর ছাপ।

একজোড়া নয়। দু'জোড়া।

একটা বড় মানুষের। আরেকটা ছোট।

ঐশি ছাপ দুটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারল— ছোট জুতোর ছাপটা সায়নির জুতোর মাপের কাছাকাছি।

— কেউ জুতো দুটো নিয়ে গেছে।

পিয়া বলল, কিন্তু কেন?

ঐশি উত্তর দিল না।

তার মাথায় তখন অন্য একটা প্রশ্ন ঘুরছে।

কাল নৌকার পাটাতনে যে রক্ত লেগেছিল, তার নমুনা কি শুধু সায়নির জুতোর তলাতেই ছিল?

নাকি...

কেউ ইচ্ছে করেই রক্তটা তাদের জুতোর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিল?

দুপুরে অনুষ্ঠান চললেও ঐশির মন বসছিল না।

একসময় সে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে গেল।

উৎসব প্রাঙ্গণের পাশে একটা চায়ের দোকানে বসে থাকা বৃদ্ধকে সে জিজ্ঞেস করল,

— কাকু, সিকিয়াঝোরা সম্পর্কে একটা কথা জানতে চাইছিলাম।

বৃদ্ধ চায়ের কাপ নামিয়ে তার দিকে তাকালেন।

— কী কথা?

— ওখানে কি বুনো হাঁস শিকার হয়?

বৃদ্ধের মুখটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল।

চারপাশে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন,

— এসব কথা এখানে জোরে বলবেন না মা।

— কেন?

— জঙ্গল শুধু গাছপালা দিয়ে হয় না। জঙ্গলেরও কিছু মানুষ থাকে।

ঐশি চুপ করে শুনতে লাগল।

বৃদ্ধ বললেন,

— কয়েক বছর আগে ওদিকে পাখি শিকার করত কিছু লোক। পরে বনদফতর ধরপাকড় শুরু করলে সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গত এক বছর ধরে আবার নাকি কিছু নৌকা গভীর জঙ্গলের দিকে যায়।

— কারা যায়?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন না।

শুধু বললেন,

— যারা যায়, তারা সবাই ফিরে আসে না।

ঐশির গলা শুকিয়ে গেল।

— মানে?

বৃদ্ধ এবার তার চোখের দিকে তাকালেন।

— গত শীতে তিনজন কাঠুরে নিখোঁজ হয়েছিল। আর একজন বনকর্মীও।

ঐশি চমকে উঠল।

— বনকর্মী?

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

— তার নাম ছিল অরুণাভ।

নামটা শুনেই ঐশির মনে হল কোথায় যেন নামটা আগে শুনেছে।

কিন্তু মনে করতে পারল না।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ঐশি ব্যাগ থেকে গতকালের সেই ছবি বের করল।

ছবির নৌকাটা আবার ভালো করে দেখতে লাগল।

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল।

নৌকার গায়ে একটা নম্বর লেখা।

S-17

সকালে ঘাটের কাঠের খুঁটিতেও একই নম্বর ছিল।

ঐশি এবার নিশ্চিত।

এটা নৌকার নম্বর নয়।

এটা কোনো সংকেত।

সে ফোনে ছবিটা আরও বড় করে দেখতে লাগল।

নৌকার সামনের অংশে একটা ছোট লোহার বাক্স দেখা যাচ্ছে।

তার গায়ে সাদা রঙে আঁকা—

17

ঐশির বুক ধক করে উঠল।

ঠিক তখন রুদ্র ঘরে ঢুকল।

— কী দেখছিস?

ঐশি ছবিটা ওর হাতে দিল।

রুদ্র বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,

— একটা কথা বলব? কাল যখন মাঝি টাকা বের করেছিল, তখন ওর বান্ডিলের মধ্যে একটা নোটে আমি একটা অদ্ভুত দাগ দেখেছিলাম।

— কী দাগ?

— কালো কালি দিয়ে লেখা ছিল—S17।

দুজনেই চুপ।

ঐশি ধীরে ধীরে বলল,
— তাহলে S17 কোনো নৌকার নম্বর নয়।
রুদ্র বলল,
— তাহলে কী?
ঐশি উত্তর দেওয়ার আগেই তার ফোন বেজে উঠল।
অচেনা নম্বর।
সে ফোন ধরল।
ওপাশে কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা নেই।
তারপর কর্কশ একটা পুরুষ কণ্ঠ—
— আপনারা আজ রাতেই কোচবিহার ছাড়ুন।
ঐশি বলল,
— আপনি কে?
— সেটা জানার দরকার নেই।
— কিন্তু আপনি আমাদের সম্পর্কে এত কিছু জানেন কীভাবে?
ওপাশে হালকা হাসির শব্দ।
তারপর লোকটি বলল—
— কারণ সিকিয়াঝোরায় আপনাদের যাওয়ার খবরটা আমরা আগেই পেয়েছিলাম।
ঐশির বুক কেঁপে উঠল।
— "আমরা" কারা?
কিছুক্ষণ নীরবতা।
তারপর উত্তর এল—
— যারা বুনো হাঁস মারে না... বুনো হাঁসের সঙ্গে যারা মানুষও ধরে।
লাইন কেটে গেল।
ঐশি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
রুদ্র জিজ্ঞেস করল,
— কী বলল?
ঐশি কোনো উত্তর দিল না।
কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে তার ফোনে একটি ছবি এসে পৌঁছেছে।
ছবিটা দেখে তার মুখের সমস্ত রক্ত যেন শুকিয়ে গেল।
সিকিয়াঝোরার জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট কাঠের ঘর।
ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ।
পিঠ ফিরে আছে বলে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু তার হাতে—

ঐশির নিজের ব্যাগ।

যে ব্যাগটা তখন ঐশির ঘরেই রাখা।

আর ছবির নিচে লেখা—

“আপনারা যা খুঁজছেন, সেটা আপনার ব্যাগেই আছে।”

ঐশি ছুটে নিজের ঘরের দিকে গেল।

দরজা খুলতেই দেখল—

ব্যাগটা বিছানার ওপর। চেন খোলা। ভেতরের সবকিছু তছনছ।

আর একেবারে নিচে...একটা ছোট্ট সাদা পালক।

পালকের গায়ে শুকনো রক্ত।

ঐশি পালকটা হাতে তুলে নিতেই— ঘরের বাইরে করিডোরে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল।

ধীরে...ধীরে...ধীরে...

তারপর দরজার সামনে এসে শব্দটা থেমে গেল।

ঐশি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার নিচ দিয়ে এবার একটা কাগজ ঢুকল।

কাগজে মাত্র একটি বাক্য—

“আগামীকাল ভোর পাঁচটায় আবার সিকিয়াঝোরায় আসুন। এবার মাঝি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে না।”

শেষ পর্ব

ভোর পাঁচটা।

সিকিয়াঝোরার জঙ্গল তখনও কুয়াশার চাদরে ঢাকা। চারপাশে এমন নীরবতা, যেন রাত আর ভোরের মাঝখানে সময়টাও থমকে আছে।

ঐশি, সায়নি, পিয়া, অপর্ণা, সঙ্গীতা আর রুদ্র—ছয়জনই গাড়ি থেকে নামল। কেউ কাউকে কিছু বলছিল না।

গতকালের সেই অচেনা ফোন, রহস্যময় ছবি, ছয় জোড়া জুতো আর শেষ চিঠি—সবকিছু যেন ওদের এখানে টেনে এনেছে। ঐশির হাতে সেই সাদা পালকটি। হঠাৎ দূরে একটা বুনো হাঁস ডাকল।

“ক্যাক... ক্যাক...”

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর থেকে আরেকটা শব্দ এল। তিনবার ছোট্ট বাঁশির আওয়াজ।

রুদ্র ফিসফিস করে বলল, — কেউ সংকেত দিচ্ছে।

ওরা ধীরে ধীরে শব্দের দিকে এগোল। কিছুদূর যেতেই সেই নৌকাটা দেখা গেল। কিন্তু মাঝি নেই।

নৌকার পাশে একটা ছোট কাঠের বাক্স। বাক্সের গায়ে লেখা— S-17

ঐশি বাক্সটা খুলল।

ভেতরে কিছু নথি, কয়েকটা ছবি এবং একটি পুরোনো ডায়েরি।

ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা—

"অরুণাভ সেন, বনদফতর।"

ঐশির মনে পড়ে গেল চায়ের দোকানের বৃদ্ধের কথা।

নিখোঁজ বনকর্মী অরুণাভ!

ডায়েরির পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে একটা জায়গায় এসে ঐশির হাত থেমে গেল।

লেখা—

"বুনো হাঁস আসল লক্ষ্য নয়। হাঁসের শিকারের আড়ালে রাতের নৌকায় অন্য জিনিস লেনদেন হয়। S-17 হল সেই ঘাটের সংকেত।"

আরও নিচে—

"মাঝিরা শুধু মাঝি নয়। ওরা পাহারাদার।"

ঐশির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

ঠিক তখন পিয়া চিৎকার করে উঠল—

— ঐশি! এদিকে আয়!

নৌকার পাটাতনের নিচে একটা লোহার দরজা।

রুদ্র আর ঐশি মিলে দরজাটা তুলতেই নিচে অন্ধকার একটা গর্ত। গর্তের ভেতর কাঠের বাক্স।একটার পর একটা। একটা বাক্স খুলতেই দেখা গেল বিরল পাখির পালক ও মৃত পাখির দেহ।

আরেকটায় ছোট ছোট প্রাণীর চামড়া। কিন্তু তৃতীয় বাক্সটা খুলতেই সবাই স্তব্ধ।

ভেতরে ছিল কিছু মোবাইল ফোন, পরিচয়পত্র এবং কয়েকটি মানুষের ছবি।

সায়নি কাঁপা গলায় বলল,

— এগুলো কার?

ঐশি একটা ছবি হাতে তুলে নিল।

একজন তরুণ বনকর্মী।

ছবির পেছনে লেখা—

“অরুণাভ—শেষবার S-17 ঘাটে দেখা গেছে।”

হঠাৎ পিছন থেকে একটা গলা—

— অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন আপনারা।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল।

সেই মাঝি। হাতে বন্দুক। তার পিছনে আরও দুজন লোক। পিয়া ভয়ে ঐশির হাত চেপে ধরল।

মাঝি ঠান্ডা গলায় বলল,

— কাল আপনাদের চলে যেতে বলেছিলাম। শুনলেন না কেন?

ঐশি সাহস করে বলল,— অরুণাভ কোথায়?

মাঝির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

— মৃত।

— কে মেরেছে?

— যারা এই জঙ্গলকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবে।

ঠিক তখন দূরে গাড়ির শব্দ।

মাঝি চমকে উঠল।

আরেকটি বাঁশির শব্দ।

কিন্তু এবার সেটা জঙ্গলের ভেতর থেকে নয়—

পুলিশের সংকেত।

চারদিক থেকে বনকর্মী ও পুলিশ বেরিয়ে এল।

মাঝি পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল।

রুদ্র অবাক হয়ে ঐশির দিকে তাকাল।

— তুই পুলিশকে খবর দিয়েছিলি?

ঐশি মৃদু হেসে বলল,

— কাল রাতেই।

মাঝির কাছ থেকে উদ্ধার হল কয়েকটি ফোন। সেই ফোনেই ছিল শিকারি চক্রের ছবি, টাকা লেনদেনের হিসাব এবং S-17 ঘাটের সমস্ত তথ্য।

তল্লাশি করতে গিয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে পাওয়া গেল একটি পরিত্যক্ত কাঠের ঘর।

সেখানেই পাওয়া গেল অরুণাভের ক্যামেরা।

ক্যামেরার শেষ ছবিটা ছিল—

একটা নৌকা।

নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে সেই মাঝি।

আর তার পাশে আরও একজন।

ছবিটা দেখে বনদফতরের অফিসার বললেন,

— এই লোকটাকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছি।

ঐশি ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

— কে উনি?

অফিসার উত্তর দিলেন,

— এই এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। বাইরে থেকে পরিবেশপ্রেমী হিসেবে পরিচিত। অথচ এই চক্রের মূল হোতা।

সবাই স্তব্ধ।

কয়েক সপ্তাহ পর

সিকিয়াঝোরায় শিকার বন্ধ হয়েছে। নৌকাগুলোতে নতুন পাটাতন বসানো হয়েছে। বনদফতরের নজরদারি বেড়েছে। ঐশিরা আবার একদিন সেখানে গেল। এবার কোনো ভয় নেই।

ঝোরার জলে রোদ ঝিকমিক করছে।

একটা বুনো হাঁস জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দূরের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

সায়নি হেসে বলল,

— মনে আছে? এই হাঁসটার জন্যই কিন্তু এত কাণ্ড!

ঐশি মৃদু হেসে বলল,

— না। হাঁসটা আমাদের শুধু পথ দেখিয়েছিল।

পিয়া বলল,

— কীসের পথ?

ঐশি জলের দিকে তাকিয়ে বলল,

— একটা জঙ্গলের ভেতরে শুধু গাছ থাকে না। থাকে মানুষের লোভ, ভয়, অপরাধ... আবার কিছু মানুষের সাহসও থাকে।

তারপর সে সেই সাদা পালকটা বের করল।

পালকটা এবার আর রক্তমাখা নয়।

ঐশি সেটাকে ঝোরার ধারে ছেড়ে দিল।

হাওয়ায় ভেসে পালকটা ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

ঠিক তখন আকাশের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল।

সায়নি হঠাৎ বলল,
— ঐশি, দেখ!
ঐশি আকাশের দিকে তাকাল।
এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো—
সবচেয়ে পিছনের হাঁসটার পাখায় যেন সাদা একটা দাগ।
ঠিক সেই পালকের মতো।
ঐশি মৃদু হেসে বলল,
— এবার ওরা মুক্ত।
জঙ্গলের বুক থেকে আবার ভেসে এল সেই পরিচিত ডাক—
“ক্যাক... ক্যাক...”
কিন্তু এবার সেই ডাকের মধ্যে কোনো ভয় ছিল না।
ছিল শুধু মুক্ত আকাশে ফিরে যাওয়ার আনন্দ।

আনন্দপতন

পিনাকী রায়

এই যে এখনও চুল এলোমেলো
কখনও মনে পড়ে সেইসব দিনও
নদীর গতিমুখ সাগরপ্রিয়
তুমিও প্রিয় ছিলে আমারও
প্রিয় তো কতোই থাকে
তবুও রাতশোয়া এককোণে উষুমকুসুম
এখন শ্রাবণপ্রীত অনিবার্য নিশি
দিন আসে দিন কাটে সমূহ একাকী
ভয় এলে তবুও বলেছি জয়
তুমিতো জয়িতা, দিলে না কখনো
সহসা পীড়নের আনন্দপতনও।

পাঠ নিই

গৌতম রায়

সত্যোপথ তালের আবেশ,
স্বরলিপি ধরে হাঁটতে হাঁটতে তোমার কাছে পৌঁছোই,
তোমার চুম্বকত্বে আমিও
এগিয়ে দেওয়া
শত সহস্র হাতের মতো একজন।
তুমি পৃথিবী হলে আমিও গঙ্গাতুলসী,
তপোবন ট্রেকিংয়ে শ্বাসকষ্টে এগিয়ে দিই স্যাকুলেন্ট।
শেকড় মাটিতে না পৌঁছালেও
যৌথ জীবন কচুরিপানার মতো,
এ ইজেলে ফুল ফোটানো যায়।

মোহিনী অবচেতন তোমার কাছে নিই জাদুবাস্তব পাঠ,
কেমন করে গার্নিশ করলে চাঁদের আলোয় গলে যায় বরফ,
কেমন ভাবে ভগীরথ করে গঙ্গা আনয়ন।
কেমন করে সূর্যের রঙ গলে গলে প্রতি মুহূর্তে আমাদের জন্মান্তর হয়।

কালপুরুষ

অমিত কাশ্যপ

তোমাকে বলা হয়নি, বকুলতলা হয়ে ঢুকে মুখের
আর পারিনি, সুন্দর বাড়িটার কথা, পাশ থেকে কে যেন
ওটা অহংকার, অনেকবার ঘুরে গেছি, পাইনি
ধর কালপুরুষের কথা, হাটবারে কেউ দেখাতে
সেজপিসি মাইথন এসে বললেন, আনলি কেন
ফিরিয়ে দে, তাঁর অতীত, তাঁর প্রিয়তা, না হারিয়ে যাওয়া
আমাদের ভেতর এক জটিলতা পেয়ে যায়
মোরগ লড়াইয়ের ভেতর যেমন আগ্রাসী পায়

তখন আমাদের মাধ্যমিক হল, ভরদুপুর হল, সজনে গাছে ছায়া ছায়া
গ্রাম দেখা, ব্যস্ততা নেই, শনিমন্দির নেই, বৃষ্টি নেই
কাঠিলজেন্স আর চিলেকোঠা থেকে দূর
আমরা তখন কোণঠাসা এক জীব, কেউ শোনে না কথা
শরীরে শরীরে মায়া এল কত, শরীরে শরীরে আবাসন
আই টি ফাইল, দূরপাল্লার ভ্রমণ, চিনির মাত্রা
এক প্রান্তের সাঁকো যখন নড়ে ওঠে, দাঁড়িয়ে যাই
নক্ষত্ররা ঝরে, গড়ায় জলে, এইসময় কত প্রিয়তা
উজ্জ্বল রাত, তোমাকে তো বলাই হয়নি, পুজো এসে গেল

কাকে দেখবে

ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য

গাছের ডালে আগুন ঝোলে
একটি পাখি দুলে দুলে
পুড়ছিল

মৃত্যুর পর প্রাণটুকু তার
কোন দেশেতে যাবে চলে
ভাবছিল

একটি চাঁদ পাগল হয়ে
আরেক চাঁদের জ্যোৎস্নাকে
খাচ্ছিল

একটা মেয়ে আগুন গোলা
রাস্তা দিয়ে আঁচল খুলে
ঘুরছিল

হয়ত ওই মেয়েটি সেই পাখিটি
আগুন আঁচল দিয়ে,মনের মানুষ
ঢাকছিল

মরণ যখন শিয়রে দাঁড়ায়
হিমশাদা সেই কোন মুখটি
দেখছিল

রাজার সেলফি

শুভাশিস হালদার

দলমাদলের মিথের মাথায় পা তুলে
সেলফি নিতেই শিহরণ জাগে,
অথচ স্বঘোষিত রাজাধিরাজ
তুরুপের তাস এখনও লুকিয়ে রেখে
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে,
অগনিত মানুষ মরছে
তোমারও আমারও
তবুও খেলছে যুদ্ধ যুদ্ধ রাজাধিরাজ ,

মৃত্যুর মিছিল যে তোমারও দিকে এগিয়ে চলেছে
তুমি বুঝতে পারছ না,

যখন বুঝবে তখন মৃত্যুর তরল অস্ত্র
তোমাকে গ্রাস করবে।

রাজা ?), তুমি এই নির্লজ্জ তাস খেলা বন্ধ করো
তোমার মত তোমার তুরুপের তাস গুলোও
ঝুর ঝুর করে ঝরে যাচ্ছে
তোমার শিকড় থেকে
সরে যাচ্ছে জ্বালানি রসদ,

নিরীহ মানুষের রক্তে যে বারুদ মেশালে
সেই বারুদের গন্ধ তোমাকে
তীব্র আঁধারের ভিতরে নিয়ে যাবে ক্রমশ
তুমি আচমকা মুছে যাবে মৃত্যুর সাথে,

বোকা মানুষের মাথায় পা রেখে সেলফি তোলা হবেনা তোমার।

ভিখিরির কাহন

প্রদীপ আচার্য

রাস্তায় অফিসের বড়সাহেবকে গাড়ি থেকে
নামতে দেখে দাঁত বের করে খেজুর করতে যাব
অমনি কোত্থেকে এক ভিখিরি এসে সামনে
দাঁড়িয়ে চার গুলিয়ে দিচ্ছিল,
আমি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললাম, হঠো,
যাও ওদিকে...বড় সাহেবকে শুনিয়ে বললাম,
বেগ ইজ দ্য প্রফেশন, আই ডোন্ট সাপোর্ট...
এদিকে কোথায় স্যার? বড়সাহেব বললেন,
একটা এসি দরকার, ছেলে মাধ্যমিক দেবে
ওর স্টাডি রুম এখন আলাদা...

আমি বললাম, স্যার, এজন্য আপনি কেন?
আমি তো আছি, আপনি নিশ্চিন্তে যান স্যার
কালই আপনার বাংলোয় এসি লেগে যাবে ...
বড়সাহেব বললেন, যাক একটা হেডেক গেল...
আমি বললাম, আমার কোয়ার্টারটা এবার
স্যাঙ্কশান করে দিন স্যার, অচেনা শহরে অনেক
টাকা ভাড়া গুনতে হচ্ছে, এবার দিয়ে দিন স্যার...
ঠিক তখনই আবার আর একটা ভিখিরি দু'জনের
মাঝখানে এসে হাত পাতলো, এবার বড়সাহেব
বললেন, উফ! দেশটা ভিখিরিতে ভ'রে গেছে...

সুরাগ

সুদীপ্ত মাজি

ঝোরার নিসর্গজুড়ে আমার বিসর্গ লেগে থাকে
অনুস্বর ও চন্দ্রবিন্দু, চাঁদ
ভূতের মুখোশ পরে ক্রমাগত ভয় দেখাতে থাকে

বোবা ও বধির হাওয়া অস্তমিত সূর্যের আলোয়
ভ্রমরের গায়ে এসে লাগে

খেলনাবন্দুক ফেলে দিই জলে, ভেসে যায়
দূরদূরান্তের স্রোতে, কান্নাপরবশ
মন মৃদু পতঙ্গের ডানায় ডানায়
উড়ে চলে দিকবিদিক ভুলে

পড়ে যায়, ফের উঠে দৌড় দেয় দিগন্তের দিকে

পালক খুঁজতে আসে একলা শার্লক হোমস
তন্নতন্ন খুঁজে
কিছুই হাতে না পেয়ে হতোদ্যম, সিগার ধরায়

দাগ

অঞ্জনা দে ভৌমিক

আলোর গভীরে যে মৃদু অন্ধকার সেই বিষাদে খুঁজি আমি আলোর স্নিগ্ধতা।
বিভ্রান্ত মেঘে কত সহজেই না সবকিছু হারিয়ে যায়!
অন্ধকার বিছিয়ে রাখা চাঁদর সরিয়ে সময়ের ফেলে আসা দীর্ঘ খাতায় অনুভূতি ঘেঁটে থাকা পথে গোপনে প্রদীপ জ্বালে রাতের ঠিকানা।
মনকে ডুবিয়ে রাখি ব্যর্থতার অক্ষরে
মুহূর্তরা লড়াইয়ের ময়দানে
ক্রমশ বাড়ে অভিমান
যেন, অপরাধের ভারে এ পৃথিবী বারেবারে শূন্য করেছে আমাকে
কি অদ্ভুত এক মায়ায় আটকে রেখেছে বিপজ্জনক চাঁদ।
এপথ ওপথ ঘুরে রাতের দোরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে, অপূর্ণ ইচ্ছেরা জেগে থাকে শূন্যতার ভিতর।
ঢেউ আসে গোপনে রহস্যময়ী সাজে অন্তরে বাহিরে, নেমে আসে সিঁড়িপথ হয়ে।
নির্জন নদীর বিষন্নতা রাতের আকাশ ধরে এগিয়ে যায়, হারিয়ে যায়।
সন্ধ্যার গভীর পথে শুধু দাগ রেখে যায়, কী ভাবে? কে জানে!

রাই ও রাঙাপথ

জয়িতা ভট্টাচার্য

যাবেই সে চলে উৎসবের শেষে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে। সমগ্রের থেকে সরে যাবে পথ একদিন। একলা আঁধার। নৌকো ঘাটে বাঁধা। সকলেই যাবে।

আমারই মতো অথবা তোমার । পানকৌড়ি কিম্বা মাছরাঙা।ভ্রান্তিহীন রোগ জর্জর সুখ কাঁথায় নিদ্রাহীন রাত। কাঁটা বেঁধা চরণ পেরিয়ে যাবে রক্ত চিহ্ন রেখে। কেউ যাবে মেঠো পথ ধরে। ভারবাহী ক্লান্ত গর্ধবের মতো ঘাড় গুঁজে;মেট্রোর হিম ঘরে ..মর্গের মতো...অথবা বাদুরের মতো হেঁটমুণ্ড পা তুলে... তুমিও পৌঁছে যাবে মৃতপ্রায় নদী পেরিয়ে পাটাতনের অন্ধকার খোলে। ভালোবাসা সংশয়হীন হলে অমনি পাঁজরে গেঁথে যায় তীক্ষ্ণ শলাকা। যত কাছে আসি তত দূরে সরে যায় পাখি। তুমিও মাঝি হবে রাতের একদিন। চলে যাবে স্বপ্ন ছিঁড়ে। একে অপরকে ছেড়ে। সমূহের থেকে দূরে। ধূধূ ডাঙার মাঠে। শাঁখ বেজে গেলে। উৎসব শেষ হলে যাবেই সে চলে।

অঙ্গরাগ

উদয় সাহা

কোন মাঠে ফেলে এলাম ছেঁড়া চপ্পল
আজ আর মনে পড়ে না

যদি বলি, সামনে যুদ্ধকাল- ভুল হবে কি?

আমাদের সামনে পাহাড়
আমরা সবসময় পাহাড়ের পাহারায়

সেই যে সকালবেলার রাখালবালক
সে আর বাড়ি ফেরেনি
হন্যে হয়ে নদীর সোঁতায় পৌঁছে গেছে বাথানের মা

অস্তসূর্যের বিভায় বেজে ওঠেনা শ্রীখোল

শুকনো পাতা দিয়ে চোখ ঢেকেছে কথক ঠাকুর

যাবই যখন, জুতোর ফিতে আর বাঁধা কেন?

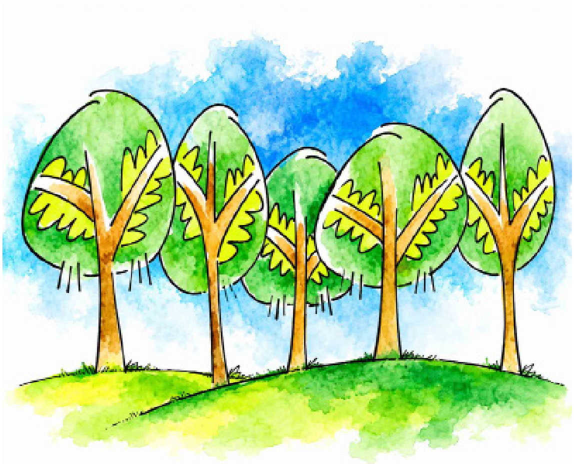

শরতের খোঁজ

পিয়ালী গঙ্গোপাধ্যায়

বৃষ্টিশেষের বাতাস কেঁদে উঠে শিশির
শরৎ-গন্ধে ভ'রে ওঠে মাটি.......

আকাশী রঙের প্রশ্রয়ে কাশবনের মাথাচাড়া,
শিউলির আনচান-
অর্ঘ্যের পদ্মফুলে সুবাস ঢালবে ব'লে,
আর, ঢাকে কাঠি পড়বার আগেই ভেসে আসে আগমনী সুর!

আমার ভিতরেও, ঠিক এমনই একটা শরৎকাল আছে!
যার ফুসফুসের পোষাক-আষাকে উঁকি দেয় সোনা সোনা রোদ,
অলিন্দের ধানক্ষেতে দেবীর চালচিত্র বোনে সাদা মেঘ,
রক্তনালীর পালতোলা নৌকোয় মাঝিদের সারিগানে মহালয়ার বোধন!
এমন আরও কতকিছু.......

শুধু বুঝতে পারি না
আমার এসবের উৎস কোথায়?
কিন্তু যখন তৃতীয় ঋতুর জোৎস্নাবেলার স্রোত জলভারে চিকচিক্ ক'রে ওঠে-

আমার ভীষণ তার কথা মনে পড়ে, তার কথা.....

আর তখনই জেনে যাই-
আমার ব্যথাতেই সে তার অস্তিত্ব দাবী করে!
শরৎমাসের কান্নাবাতাস বন্ধু হয়ে যায় আমার পূর্ণিমারাতের অশ্রুফোঁটার,

আশ্বিনের আবহে এই বেদনাবোধের সুখে-
আমাকে তলিয়ে নেয় সেই শরৎপুরুষ.....

নিবন্ধ

কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে

দেবাশিস পাঠক

কয়েক বছর আগে জানুয়ারি মাসের কথা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী। নাম 'তন্ত্রঃ এনলাইটেনমেন্ট টু রেভলিউশন'। অর্থাৎ, তন্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবের জ্ঞানদা শক্তি। সেই প্রদর্শনীতে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা ভালমতোই টের পেয়েছিলেন, তন্ত্র এবং তন্ত্রের মূল শক্তি কালী পাশ্চাত্য সমাজের কাছে কতটা অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যাঁরা তন্ত্রকে মধ্যযুগে শরীরী বিদ্যার উপকরণের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারেন না, তাঁর আসলে যেটা জানেন না বা বুঝতে চান না, তন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মূলে আছে 'তন' যার অর্থ 'বয়ন'। তন্ত্র তাই দেব ও দেবীর মধ্যে সংলাপ, কথার বয়ন। কালী হলেন তান্ত্রিক সাধকদের কাছে যুগপৎ মাতৃশক্তি ও মাতৃবাৎসল্যের প্রতীকস্বরূপা।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে তন্ত্রে পূজ্য সেই কালিকা মৃত্যু ও কালের দেবী হিসেবে একযোগে রক্ষাকর্ত্রী ও ধ্বংসকারিকা রূপে ধরা দিয়েছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের চোখে। কিন্তু ইংরেজ শাসক ও মিশনারির দল সে কথা বুঝল অন্যভাবে। মিশনারিরা ভাবল, নগ্নিকা রূপের কারণে দেবী আসলে অসভ্য অনুন্নত বর্বরদের পূজনীয়া। ওই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একটি মাটির কালী মূর্তি সেই হিসেবেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে উপহার দিয়েছিলেন জনৈক মিশনারি ১৮৯৪ সালে।

ওখানে প্রদর্শিত একটি মুদ্রিত ছবি। মুদ্রণকাল ১৮৮৫। দেবী নৃমুণ্ডমালিনী। ইংরেজ অফিসাররা ভেবেছিল ওগুলো বুঝি ওঁদেরই কাটা মুণ্ডু। তাই ওই ছবি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ভাবাটা খুব একটা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ, বিপ্লবীদের প্রচারপত্রে কালীর ছবি থাকত আর ব্রিটিশদের উল্লেখ থাকত সাদা ছাগল হিসেবে যেগুলোকে মায়ের বলির জন্য হাঁড়িকাঠে চড়াতে হবে। বিশ শতকের গোড়ায় তাই কালী আর বিপ্লব সমার্থক হয়ে গেল ব্রিটিশ রাজশক্তির চোখে। ১৯০৭-এ কের তাঁর ‘পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া’ রিপোর্টের শুরুতেই লাগিয়ে দিলেন কালীর ছবি।

লাগাবেন নাই বা কেন? অগ্নিশিশুদের সঙ্গে কালীর যে অবিচ্ছেদ্য যোগ।

সাল ১৯০৮। পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির পুজো শুরু করলেন বাঘা যতীন। অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে মিলে তিনিই তৈরি করেছিলেন এই সমিতি। আলিপুর বোমার মামলার জেরে সেই সমিতি উঠে গেল। বন্ধ হয়ে গেল পুজো। বুড়ি বালামের যুদ্ধে শহিদ হলেন বাঘা যতীন। অতুলকৃষ্ণ জেলে। জেল থেকে বেরিয়ে তিনিই ফের শুরু করলেন এই কালী পুজো। ১৯২৮-এ। ১৯৩০-এ এই পুজোর সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র। কালী অর্চনা আর ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম অন্বিত তো হবেই।

বাঁকুড়ার রামদাস চক্রবর্তীর বাড়ি। সেখানে আনাগোনা প্রফুল্ল চাকীদের। এখানকার কালীতলাতেই চলত তাঁদের শরীর চর্চা, অস্ত্রশিক্ষা। শুধু পুজো উপলক্ষে নয়, রোজ সকালে বিকেলে, নিয়ম করে। ইতিহাসবিদ রথীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী তাই বলতেন, এই মা কালীর অঙ্গে বিপ্লবীদের গন্ধ মিশে আছে।

বাঁকুড়া শহরের এখনকার ১২ নং ওয়ার্ডে বড় কালীতলা। সেখানে ১৮৬৩তে তৈরি হয় একটা চুন সুড়কির বাড়ি। লোকের মুখে সেটির পরিচিতি ‘বিপ্লবী বাড়ি’। এক কালে এখানেই ছিল বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের কারণেই বিপ্লবীরা ডেরা বেঁধেছিলেন এখানে। বাড়িতে পুলিশ ঢুকলেই অস্ত্রশস্ত্র পুঁটলিতে বেঁধে পাশের পুকুরে ফেলে দেওয়া হত।

যারা বীর, যারা আকশে জাগাত ঝড়, যাঁদের কাহিনি বিদেশির খুনে, গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে আজও রোমাঞ্চকর, তাঁদের কাহিনিতেই আজও লগ্ন শক্তির দেবী কালী।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে।

।।২।।

জটাজূট সমাযুক্তাং অর্ধেন্দু কৃতশেখরাম্।

লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্।।
অতসীপুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবন সম্পন্নাং সর্বাভরণ ভূষিতাম্।।

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে মায়ের চামুণ্ডারূপের পূজামন্ত্র। রোজ এই মন্ত্রটি পাঠ করতেন যিনি তাঁর নাম প্রফুল্ল চাকী। অরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ তাঁকে রংপুর থেকে কলকাতায় এনেছিলেন। উদ্দেশ্য, পূর্ববঙ্গের ছোটলাট বামফিল্ড ফুলারকে হত্যা। সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবে তার পর থেকেই প্রফুল্লর বাস মানিকতলার বোমার আড্ডায়। সেখানেই বিষ্ণুভাস্কর লেলেকেও নিয়ে এসেছিলেন বারীন। লেলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। অরবিন্দের যোগ শিক্ষক। বারীনও তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার জন্য। লেলে দেননি। সংসারীকে তিনি ওই মন্ত্রদীক্ষা দেন না। কলকাতায় আসার পর লেলের ঠিকানা স্কট লেন। অরবিন্দ সেখানেই থাকেন। ওই একই বাড়িতে।

মানিকতলা বোমার আড্ডায় আসা ইস্তক লেলের নজর ওই বছর কুড়ির যুবা প্রফুল্লর ওপর। তিনি মনে করতেন, "ভারত একদিন স্বাধীন হবেই; তা অনিবার্য। কাল প্রাতে উদয়াচলের কোলে সোনার থালা সূর্য উঠবে, এ যেমন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, ভারতের ভাবী স্বাধীনতাও তাই।" তবে, দেশকে, মানুষকে মুক্ত করতে হলে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধানোর দারকার নেই। 'ভারত বিনা রক্তাপাতেই মুক্ত হবে।' তাই, তাই-ই, তিনি অরবিন্দ— বারীনের কাছে প্রফুল্ল চাকীকে চাইলেন। তাঁর বক্তব্য, "এমন সুলক্ষণ ছেলেকে নষ্ট করে লাভ কী? একে আমার সঙ্গে দাও, ওকে পরম যোগী করে দেব। ওর মধ্যে কয়েকটা বিভূতির চিহ্ন রয়েছে।"

প্রফুল্লকে নিয়ে চারুচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তর্কাতর্কি বেধে বেধে যায় লেলের। চারুচন্দ্র যে-সে লোক নন। রীতিমতো আই সি এস। ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা। মুম্বইতে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, পরে জজ হন। অথচ ওঠাবসা অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিকদের সঙ্গে। মুম্বইতে থাকার সময়েই গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল তিলক আর গণেশ দেউস্করের সঙ্গেও। এহেন চারুচন্দ্র লেলের অহিংস পথে স্বাধীনতা লাভের ভবিষ্যদ্বাণী মানতে রাজি ছিলেন না। মনিকতলার বোমার আড্ডার কোনও সদস্যই লেলের মতে আস্থা রাখেনি। সম্ভাব্য শিষ্যদের হারিয়ে বিষ্ণুভাস্কর লেলে বঙ্গদেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন প্রফুল্লকে। চারুচন্দ্র তো বটেই, অরবিন্দ বারীনরাও প্রফুল্লকে ছাড়তে রাজি হননি। ফলে তাঁকে ছাড়াই বাংলা ছেড়ে হরিদ্বারের পথে পা বাড়ান লেলে।

এসব ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের ঘটনা। আর সে বছরই, মে মাসে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, মরতে হল প্রফুল্ল চাকীকে। নিজের গুলিতে কিংবা দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অব্যর্থ নিশানায়।

এবং প্রফুল্ল কোনও ব্যতিক্রম নন।

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে' বর্ণিত দেশমাতৃকার মূর্তি। তাঁর দ্বিসপ্তকোটি ভুজে ভিক্ষাপাত্র নয়, খর করবাল।

অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিরূপিণী কালীর অনবদ্য বন্দনা। মায়ের স্নেহ-আলিঙ্গনজ্ঞানে মৃত্যুকে বরণ করার আহ্বান। 'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুকে যে বাঁধে বাহুপাশে/কালনৃত্য করে উপভোগ/মাতৃরূপা তারই কাছে আসে'— এরকম সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপন 'কালী দ্য মাদার' কবিতায়।

ওই একই নামে নিবেদিতার প্রবন্ধ। সেখানেও সরাসরি শক্তিপূজায়, মাতৃমন্ত্রে আস্থা সংস্থাপন। "ভীরুর ক্লান্ত হতাশার দীর্ঘশ্বাস নয়, আত্মরক্ষার জন্য দয়াভিক্ষাও নয়, ভাগ্যের পায়ে নিরুপায়ে আত্মসমর্পণ কখনোই নয়। আনত হয়ে শোনো— বহুশতাব্দীর দুঃখ-বেদনা পার-হয়ে-আসা ভারতভূমি বিশ্বমাতার চিরন্তনী মাতার কাছে বলছেন, তুমি যদি বিনাশ কর আমায়, তবু তোমাতেই রাখব আমার অটল বিশ্বাস।"

এবং অগ্নিযজ্ঞের অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'। 'কর্মযোগীন '-এর পাতায় প্রকাশিত সেই আগুন ঝরানো বক্তব্য। 'আমরা যে শক্তি প্রয়োগ করি তা মাতা ভবানীর, যিনি রক্ত মাংসের বাহুতেও ধরেন বজ্র এবং ঝঞ্ঝার অমিত বিক্রম। দেবকুল নির্মিত তাঁর কৃপাণ তোমাদেরই জন্য।" Bhavani's swords for you the gods prepare.

এসবের নিট ফল একটাই। শত্রু নিধনের জন্য মাতৃশক্তির আশীর্বাদ আবশ্যক, এই অনুভবে বাংলার যৌবনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অনিবার্য সঞ্চার। জগন্মাতা কালিকা ও দেশমাতার সহজ সমীকরণে বাংলার যুবশক্তি বুঝে গেল, শক্তিময়ী মা যদি একবার জেগে ওঠেন, তবে বিদেশি ব্রিটিশ শক্তি এবং দেশি নরমপন্থীর দল, দুটোই একেবারে বিলুপ্ত হবে।

আর এসবেরই অনিবার্য ফল পরিণামে বঙ্গভূমিতে যা যা ঘটেছিল সেসবের প্রত্যক্ষ দর্শনে বিস্ফারিত নেত্র হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকায় ইউরোপে গিয়েছিলেন। শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মার ডাকে সাড়া দিয়ে 'ইন্ডিয়া হাউসে' বিপ্লববাদ প্রচার করেছেন। মাদাম কামার মাধ্যমে ফরাসি সোশ্যালিস্ট দলের গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ। প্যারিস থেকে বোমা তৈরির বিদ্যা শিখে দেশে ফিরেছেন ১৯০৭-এ। মেদিনীপুরে ফিরে দেখেন, "গুপ্ত সমিতির পূর্বের আড্ডা তুলে দিয়ে সত্যেনের (সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মেদিনীপুরের গুপ্ত সংগঠনের নেতা; সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে অধিবেশন পণ্ড করানোর ব্যাপারে তিলককে সাহায্য করেন; বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার বিলি করার দায়ে ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হলে

তাঁকে মিথ্যা অছিলায় মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন, এই অভিযোগে সত্যেন্দ্রর সরকারি চাকরিটি গিয়েছিল।) বাড়ির পাশে এক ঘরে 'আনন্দমঠ' নাম দিয়ে তাতে একটি হাতখানেক লম্বা কালীমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।" এর কারণ জিজ্ঞেস করায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু উত্তর দিয়েছিলেন, "সকলেই এইরকম একটা কিছু চায়। হঠাৎ কী জানি কেন দেশটা বেশির কম কালীভক্ত হয়ে উঠেছে।" আর ক্ষুদিরাম বসু, যিনি আর কিছুদিন পরেই মজঃফরপুর বোমার মামলায় ধরা পড়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইবেন, সেই অগ্নিশিশু মজা করে উত্তর দিয়েছিল, "আর যাই হোক কালীর কৃপায় বেশ পাঁঠা খেতে মেলে; আর পাঁঠার লোভে ভক্ত জোটে।"

হেমচন্দ্র লক্ষ করেছিলেন, তাঁদের মুরারীপুকুর আর ভবানীপুরের গোপন আড্ডাস্থলে কালীর ছবি ঝোলানো ছিল। 'অন্য আড্ডাতে এবং অনেক লোকের বাড়িতে এইরকম ছবিতে ফুল চন্দন দিয়ে নিত্য পূজা করা হত।'

এসবই তাঁর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ, স্বদেশি আন্দোলনের আগে ছবিটা ছিল অন্যরকম। তখন পৈতেধারী ব্রাহ্মণ যুবকও পৈতেটোকে 'অকারণ জঞ্জাল' ভেবে খুলে রেখে দিত। দেবদেবীর মূর্তি বা ছবির সামনে 'মস্তক অবনত করতে' দ্বিধা বোধ করত। হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করাটাই ছিল রেওয়াজ।

কিন্তু কালী ঝড়ে সব এলোমেলো। কালকে গ্রাস করেন বলে ওই দেবীশক্তির নাম কালী। সেই মহাকালীই প্রাক-স্বদেশি যুগের তাবৎ শক্তি বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করে বাংলাকে নব শক্তি মন্ত্রে জাগিয়ে তুললেন। দাবানলের মতো শাক্ত জোয়ার দেখা দিল বাঙালির হৃদিমূলে।

২৬ ফাল্গুন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। ইংরেজির মার্চ, ১৯০৬। 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশিত হল। সেখানে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখলেন, "তোমার অন্তরমুখী সাধনার গুণে এক পাষণ্ডদলনী রিপুসংহারিণী শক্তি জাগরিত হইবে, যাহার বলে যোগাবিঘ্নকারীরা প্রতিহত হইবে ... প্রাণ যায় সেও স্বীকার, স্বাধীনতার ধ্বজা ভারত-আকাশে উড়াইবই উড়াইব।"

ততদিনে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষার সঙ্গে দেবী কালীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। মাত্র বারো বছর বয়সে অনুশীলন সমিতির সদস্য হয়েছিলেন জীবনতারা হালদার। তিনি স্মৃতিচারণ করতে বসে লিখছেন, "গুপ্তকার্যের জন্য কালী মন্দিরে দীক্ষা দেওয়া হইত। দেবী সমক্ষে স্বীয় অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইত।"

বাংলায় তখন কলিযুগের বলয়ে কালীযুগের বোমা বিস্ফোরণ। দিকে দিকে কালীমায়ের সন্তানরা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বিপ্লবের আগুন ছড়াচ্ছেন।

ঢাকায় অনুশীলন সমিতির পুলিন দাস। গলায় আর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে ত্রিশূল আঁকা। সমিতিতে যোগ দিতে কেউ আসলে তাকে নিয়ে যাওয়া হত রমনা-সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে। সেখানে দীক্ষার্থীর কপালে এঁকে দেওয়া হত রক্তচন্দনের টীকা।

তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হত, সে এই সমিতি কোনও দিন ছাড়বে না। চরিত্র সব সময় 'নির্মল ও পবিত্র' রাখবে। সমিতির ভেতরকার বিষয় নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে আলোচনা করবে না। সে বিষয়ে কোনও মন্তব্যও করবে না। বাবা-মা-ভাই-বোনের স্নেহ ও বাড়ির মোহ, সব ত্যাগ করবে। এক কথায়, 'জীবন ও ঐহিকের সম্পদের বিনিময়ে', 'সমিতির প্রসার কার্যে' আত্মনিয়োগ করবে। এই পুলিন দাস সাক্ষাৎ ত্রিপুরালিঙ্গ স্বামীর শিষ্য। বিপ্লব আন্দোলনের আবহে স্বামীজির আশ্রমে শিবলিঙ্গের সঙ্গে কালীমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাঘাযতীনের শিষ্য চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী। ভয়ানক কালীসাধক। 'মেদিনীপুরের বোমা ও পিস্তল' নিয়ে লিখতে বসে অতুলচন্দ্র বসু বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠায় জানাচ্ছেন, রাতের পর রাত বীরাচারী সাধনায় শ্মশানে ঘুরতেন চিত্তপ্রিয়। বুড়িবালামের যুদ্ধে নিহত হন তিনি।

বাঘাযতীনের সহযোগী ছিলেন কলকাতার দর্জিপাড়ায় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের কালী মন্দিরের পুরোহিতমশাই নিজে। সঙ্গে নিয়েছিলেন ভাইপো সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যকেও। ত্রিপুরার মেহার কালীবাড়ির পুরোহিত সর্বানন্দ ঠাকুরের কাছেও আশ্রয় পেতেন বিপ্লবীরা। মহানির্বাণ মঠের মহানন্দ ব্রহ্মচারী বিপ্লবী সংগঠনগুলোতে কর্মীর জোগান দিতেন। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিককে তিনিই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বামাক্ষ্যাপার শিষ্য তারাক্ষ্যাপা। গোয়েন্দা রিপোর্টে তাঁর বিষয়ে পরিষ্কার লেখা হয়েছিল, "He is believed to be a disciple of an old Sadhu called Bamakhyapa of Tarapur in Birbhum district…।" তিনি অবশ্য বিপ্লবের অগ্নি-সমিধের খোঁজ পেয়েছিলেন গঙ্গাবাঈ মাতাজির কাছে। গঙ্গাবাঈয়ের বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রের আর্কট অঞ্চলের জমিদার। বাবার মৃত্যুর পর জমিদারি দেখতেন গঙ্গাবাঈ। ঘোড়ায় চড়তে পারতেন। চালাতে পারতেন তলোয়ার। বন্দুকও। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংঘাতের জেরে ত্রিশিরা পল্লীর পাহাড়ে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। ছাড়া পেয়ে তপস্যার করতে চলে যান বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে। সেখানেই ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে পরিচয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর নানা সাহেবের সঙ্গে নেপালে চলে যান। ফিরে আসেন এই বাংলায়, পলাশীর কাছে, জুড়নপুরের শ্মশানে। জুড়নপুরের কালীবাড়ি অঙ্গপীঠ রূপে স্বীকৃত। সেখানেই তপশ্চর্যা মাতাজির। আর সেখানেই বাঘাযতীন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো বিপ্লববাদের মশালধারীদের সঙ্গে যোগাযোগ।

এই গঙ্গাবাঈ মাতাজিই কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন মহাকালী পাঠশালা। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে। তাই-ই, বোমার যুগে মহাকালী পাঠশালার ওপর গোয়েন্দাদের নজর ছিল। আর নজর থাকবে না-ই বা কেন? ওই পাঠশালার বাড়িতেই তো 'বঙ্গধর্ম মহামণ্ডল'-এর অফিস। আর সদস্যরা সবাই চরমপন্থী হিসেবে 'কুখ্যাত'।

ওই জুড়নপুরের শ্মশানেই তারাক্ষ্যাপার সঙ্গে মাতাজির যোগাযোগ। আর তারাক্ষ্যাপার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপতি

মজুমদার প্রমুখ বিপ্লবীদের। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বারীন ঘোষরাও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। 'সন্ধ্যা' আর 'যুগান্তর'-এ তারাক্ষ্যাপার লেখা বের হত। মানিকতলা বোমা মামলা শুরু হলে তারাক্ষ্যাপা আত্মগোপন করেন সিংভূমের চক্রধরপুর এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে। পরে, ১৯০৯ সাল নাগাদ কলকাতায় ফিরে এসে গড়ে তোলেন 'সারথী যুবক মণ্ডল'। এই সংগঠনটি সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হয়, এ হল 'second only to Anushilan'। কারণ এর সদস্য-সংগঠকরা সবাই 'took part in crimes of violence'.

৬ মে, ১৯০৭-এ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালির কাছে আবেদন রেখেছিলেন, প্রতিটি পরিবারের অন্তত একটি ছেলে ক্ষাত্রধর্ম অনুশীলন করুক, ওরা কালী মায়ের বোমা নিয়ে খেলা করুক।

কেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের চরমপন্থী পর্বে মা কালীকে নিয়ে এত মাতামাতি?

বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এর পেছনে প্রধান কারণটা লক্ষ করেছিলেন। বিপ্লবীদের মনে হয়েছিল 'কংগ্রেস আবেদন ও নিবেদনের পন্থা দ্বারা দেশের লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিনষ্ট মনুষ্যত্বকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য বিষস্য বিষমৌষধম দরকার'। নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক তো অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে পারে না। তাই দরকার সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই-ই, 'কাপুরুষ' জাতিকে জাগিয়ে তোলার আশ্রয় হতে পারে একমাত্র কালী সাধনা।

অরবিন্দ আবার অন্য কারণে কালীকে আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ধর্মের প্রধান কাজই হল মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস আর শক্তি জাগিয়ে তোলা। গণপতির আরাধনায় যদি মারাঠি হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে তবে বাংলার মানুষের উদ্দীপনের জন্য আবশ্যক শক্তিরূপিণী কালীর আরাধনা। এটাই বিপ্লব শিখা প্রজ্জ্বলনের 'পপুলিস্ট' উপায়।

এই দুটি কারণের বাইরে সম্ভবত আরও একটি কারণে বাংলায় স্বদেশি যুগে কালী অর্চনায় জোয়ার আসে। সেটা হল, 'মা' ডাকে বিভেদ-বৈষম্যর পাঁচিল ভেঙে যাবে। হিন্দু-অহিন্দু, ধনী-নির্ধন, উচ্চবর্ণ-দলিত, সবাই 'মা-মা' বলে দেশমায়ের শিকল ঘোচাতে প্রাণ বাজি রেখে এগিয়ে আসবে। এরকম একটা ভাবনা।

মুক্ত কণ্ঠ তাই বাঙালি সেদিন গেয়েছিল,"ভয় কি মরণে?/রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ, সমর রঙ্গে।"

আসলে, যে অগ্নিলগ্নে বাঙালি অনুভব করেছিল, 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ যদি সঃ ইংরেজ দ্বেষী', সেই পরমক্ষণেই শক্তিপূজার অঞ্জলি দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হয়েছিল।

আর হবে না-ই বা কেন?

“কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে”। কলি যুগে কালী পুজো বিনা গতি নেই।

।।৩।।

এবার বিপ্লবী নয়, অন্য রামকৃষ্ণর কথা। ইনি পরমহংস নন, ত্যাগী রাজা।

গঙ্গার তীরে সেদিন বড্ড ভিড়। নদীতে নেমেছেন এক সাধক পুরুষ। গাইছেন শ্যামা সঙ্গীত। গঙ্গার গভীরে নামতে নামতে রচনা করছেন গানের চরণ। আর সুরে সুরে ভাসিয়ে দিচ্ছেন মাতৃ-আকুতি আকাশে বাতাসে।

“মন যদি মোর ভুলে
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে;
আনরে ভোলা, জপের মাল্ ভাসি গঙ্গাজলে।”

ভিড়ের ভেতর কেউ একজন জানতে চাইল, “ইনি কে গা? গলাটা ভারি সুন্দর।” ভিড়ের ভেতর থেকেই চলে এল উত্তর পেয়ে যাচ্ছে, “কথা কোয়ো না। মন দিয়ে গানটা শোনো। ওতেই পেয়ে যাবে উত্তর।”

সত্যিই তাই। বাতাসে সুরমধুর ভাসতে ভাসতে গানের বাণী চরাচরকে জানিয়ে যাচ্ছে, সদ্য উৎসরিত এই গানের পদকর্তার নামটুকু।

“ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে - / আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাটো, কী আছে কপালে।।”

‘রামকৃষ্ণ? এঁর নাম বুঝি রামকৃষ্ণ?’

‘হ্যাঁ, ইনি রানি ভবানীর ছেলে, রাজা রামকৃষ্ণ।’

গায়কের পরিচয় পেয়ে ঔৎসুক্য বাড়ে ভিড়ের। অনেকেই জানতে চায়, ইনি এখানে কেন? নাটোরের রানি ভবানী। তাঁর ছেলে এখানে, এতদূরে কেন, সে জিজ্ঞাসা তো থাকবেই। ভিড়ের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দেয়, কার্য-কারণ বৃত্তান্ত। তাতে লৌকিক পরিণতির উৎসে লেগে থাকে অলৌকিকের ছিটে।

ভবানীপুর সতীপীঠ, শক্তিপীঠ। সতীর ডান পায়ের মল পড়েছিল বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার এই অঞ্চলে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে করতোয়া নদী। এই পীঠস্থানে পঞ্চমুন্ডির আসনে বসেছিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁর ওপর তাবৎ সম্পত্তির দায়িত্বভার তুলে দিয়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন রানি ভবানী। চল্লিশ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদবলে ‘মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর’ খেতাব নিয়ে জমিদারিতে বসেন। কিন্তু ওই বসাটুকুই সার। বিষয়-আশয়ে রামকৃষ্ণ সদা উদাসীন আপনভোলা মানুষ।

কালী সাধনাই তাঁর জীবন সাধনা। বাংলায় তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমানা। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির ধার্য করা খাজনা জমা দিতে না পারলে জমিদারি মহল নিলামে ওঠে। রামকৃষ্ণের তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। ফলে একের পর এক মহল্লা ইংরেজ কোম্পানি নিলামে চড়াল। আর ঘুর পথে সেগুলো কিনতে লাগলেন কালীশঙ্কর রায়। রানি ভবানীর আমল থেকে নাটোরের জমিদারির দেওয়ান পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। নাটোরের নিলাম হওয়া জমিদারি কিনে তিনি স্থাপন করেছেন নড়াইলের জমিদারি বংশ। একইভাবে নাটোরের জমিদারির অংশ কিনে কিনে রাজা রামকৃষ্ণের আর এক পার্শ্বচর অনুপনারায়ণ হাওড়ার সেরপুরে জমিদারি বসিয়েছেন। তবে সব মহল্লাই যে এঁরা কিনেছেন, তা নয়। পাথুরিয়া গিয়েছে ময়মনসিংহের চৌধুরীদের এক্তিয়ারে। আড়পাড়া পরগণা কিনেছেন গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায়রা। রানি রাসমণির শ্বশুর প্রীতিরাম মাড়, রানাঘাটের পালচৌধুরীরা, শ্রীরামপুরের গোঁসাই পরিবার, এঁদের সবার ভাগেই কিছু কিছু করে গিয়েছে নাটোরের সম্পত্তির মালিকানা।

জমিদারি বিনাশের পথে। এক একটা মহল্লা নিলামের কথা এসে পৌঁছায় রামকৃষ্ণের কানে। আর তিনি সোল্লাসে বলে ওঠেন, "আঃ! বাঁচলাম। আমার আর একটা বন্ধন ছিন্ন হল।" সেই সঙ্গে আদেশ দেন। সেই আদেশমাফিক জয়কালী মন্দিরে মহাসমারোহে পুজোর আয়োজন হয়। যোড়শোপচারে পুজো। নাট মন্দিরে চন্ডী পাঠ। বাজতে থাকে কাঁসর ঘণ্টা ঢাক শঙ্খ। মন্দির থেকে আসা সেসবের আওয়াজ শুনলেই নাটোরবাসীর চোখে জল চলে আসে। তারা টের পায়, আবার একটা পরগণা হাত ছাড়া হল। তাদের শান্তির জীবনে উদিত হতে চলেছে নতুন কোনও জমিদার নামক অপদেবতা। রানি ভবানী বা রাজা রামকৃষ্ণের মতো নয়া জমিদার যে প্রজাবৎসল হবে না, সে বিষয়ে তারা একশ শতাংশ নিশ্চিত। তবে রামকৃষ্ণের তাতে কিস্যু এসে যায় না। তিনি একদিকে ব্রাহ্মণ ভোজন, অন্য দিকে কাঙালি ভোজনের আয়োজনে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে, তা নিয়ে ব্যস্ত।

এভাবে চলতে চলতে একদিন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আর নয়। এবার কালী পদে সর্বস্ব সমর্পণ। সেই সংকল্প নিয়েই ভবানীপুরে পঞ্চমুন্ডীর আসনে একমনে সাধন।

কিন্তু সিদ্ধি এল কই? রাতে দিগন্তে আলুলায়িত কেশ বিস্তার করে, অন্ধকারে দিব্য জ্যোতি ছড়িয়ে আবির্ভূতা হলেন স্বয়ং দেবী। তাঁর রাঙা পায়ে লুটিয়ে পড়লেন রাজা রামকৃষ্ণ। দেবী স্পষ্ট বললেন, সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না রাজা।

কেন?

প্রত্যেক জননীর মধ্যে দেবী বিরাজিতা। প্রত্যেক জননীই জগৎজননীর মর্ত্য রূপ মূর্ত রূপ। সেই হিসেবে মা কালী আর রানি ভবানী এক ও অভিন্ন। সেই রানি মায়ের নির্দেশ অমান্য করেছেন রামকৃষ্ণ। জমিদারি বাঁচানোর জন্য তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন রানি। দিয়ে

গিয়েছিলেন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব। সে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন রামকৃষ্ণ। সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের অছিলায় মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। সেই মা যদি ক্ষমা করেন, তবেই রামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা আছে। নচেৎ নয়। কিছুতেই নয়।

পাপ করেছেন সাধক। তাঁর শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে।

শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ছুঁড়ে ফেললেন দেবী। ভবানীপুর থেকে একেবারে দক্ষিণে। পাকুড়িয়ার সেতুর কাছে। এসবই আজ থেকে ২২৫ বছর আগেকার কথা। আজকের হিসেবে ভবানীপুর আর পাকুড়িয়ার দূরত্ব ৩৬৪ কিমি। ১৯ নং জাতীয় সড়ক ধরে যেতে সময় লাগে কম করে ১০ ঘন্টা। একটা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। আর একটা পশ্চিমবঙ্গের হাওড়াতে।

হাওড়ার পাকুড়িয়া সেতুর কাছ থেকে তাঁকে তুলে রানি ভবানীর কাছে নিয়ে যায় স্থানীয় মানুষজন। অবাধ্য ছেলের মুখ আর দেখবেন না, ঠিক করেছিলেন রানি মা। কিন্তু রামকৃষ্ণের দশা দেখে চোখ তাঁর ভিজল জলে। মায়ের মন। রাগ আর রইল না। ক্ষমা এল আপনি। তার পর রামকৃষ্ণ চলে আসেন গঙ্গা তীরে । তিন দিন থাকার পর নদীতে অবতরণ।

"রাজা মশাই, আর যাবেন না। ওখানে নদী বড় গভীর।" চিৎকার ভেসে এল তীরের ভিড় থেকে। সে কথায় কর্ণপাত করলেন না রাজা রামকৃষ্ণ। তিনি তখন ডুবে গেছেন স্বরচিত শ্যামা সংগীতে।

" জয় কালী, জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়,
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়।
অনন্ত রূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায় ?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙা পায়।।"

***

দেউড়ি পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে পেয়াদা ঢুকল রানির অন্দর মহলে। জানাল, নিজের শেষকৃত্য করানোর জন্য যাকে একদিন দত্তক নিয়েছিলেন রানি ভবানী, আজ তাঁরই শেষকৃত্যের জন্য তাঁকে যেতে হবে। কালী নাম জপতে জপতে গঙ্গাবক্ষে চির নিমজ্জিত হয়েছেন রাজা রামকৃষ্ণ।

।।৪।।

পরিশেষে বরানগরে জয় মিত্রের কালীবাড়ির কথা।

বরানগর। কলকাতা উপকণ্ঠে এক প্রাচীন জনপদ। আদি নাম বরাহনগর। শূকরনগরী।

কেন শূকরনগরী ?

সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে ডেরা বেঁধেছিল ডাচ, মানে ওলন্দাজরা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক স্যার স্টেনস্যাম মাস্টার এখানে এসেছিলেন ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন তিনি দেখেছিলেন এখানে বছরে প্রায় তিন হাজার শুয়োর মারা হয়। আর সেগুলোর চামড়া বিদেশে রফতানি হয়। শুয়োর মারার এত বড় কসাইখানা থাকার কারণেই এই ওলন্দাজ বসতির নাম হয়ে গিয়েছিল বরাহনগর। সেখান থেকেই সম্ভবত লোকমুখে বরানগর। পরবর্তীকালে অবশ্য শুয়োরের চামড়ার ব্যবসা উঠে যায়। তার জায়গায় বরানগর হয়ে ওঠে পাটের কারবারের পীঠস্থান। সে সময় কলকাতার উপকণ্ঠে বড় নগর, এই অর্থেও বরানগর নামটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে পারে।)

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগেকার ওলান্দাজ কুঠি আজ আর নেই। কিন্তু রয়ে গেছে তার স্মৃতিবাহী কুটিঘাট।

কুঠিঘাটে দাঁড়ালে ওপারে বেলুড়মঠ। আর এপারে জয় মিত্রের কালীবাড়ি।

শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলে ছিলেন জয়রাম মিত্র। তাঁর বাবা রামচন্দ্র মিত্র বরানগরে এসেছিলেন ওলন্দাজ সাহেবদের মুৎসুদ্দি বা ম্যানেজার হয়ে। জয়রাম মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির দেখেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির গোপীমোহন ঠাকুর শ্যামনগরের কাছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সেই মন্দিরের আদলেই জয়রাম তৈরি করেছিলেন তাঁর কৃপাময়ী কালীর নবরত্ন মন্দির।

মূলাজোড়ের মতো এখানেও রয়েছে বারোটি শিব মন্দির। ভুবনেশ্বর, অমরনাথ, চন্দ্রনাথ, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ, পশুপতিনাথ, রামেশ্বর, উমানন্দ, কেদারনাথ, সোমনাথ, তারকনাথ আর আদিনাথ।

১৮৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কৃপাময়ী। দক্ষিণাকালীর শিলাময়ী বিগ্রহ।

সামনেই নাটমন্দির।

এক সময় দুপাশে দুটো নহবতখানা ছিল। ৫ অক্টোবর ১৮৬৪। এক ওলন্দাজ বাণিজ্যতরী এসে ধাক্কা মারে নহবতখানায়। ফলে ভেঙে যায় সেটি।

১৮৪৮-এ জয়মিত্র নিজের অট্টালিকার একাংশে এই মন্দির নির্মাণ করেন। তবে জয়রাম প্রাসাদ নির্মাণের আগে শোনা যায়, এখানে ছিল ওলন্দাজদের কবরখানা। এক সময় এই কালী মন্দিরে বলি দেওয়া হত। কিন্তু আজ সেখানে বলি দেওয়ায় হাঁড়িকাঠটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং মন্দিরের নীচে ডানদিকে প্রস্তরফলকে লেখা আছে বলি বন্ধ হওয়ার বিবরণ।

সিন্ধু বিন্দু নেত্র চন্দ্র পরিমিত সনে।
পূর্ণানন্দে সাথে করি এক শুভক্ষণে।

বালানন্দ ইষ্টদেব আসিয়া হেতায়।
হেরিলেন জীববলি আর্ত বেদনায়।।
ক্ষান্ত কর রক্তস্রোত দিলেন বিধান।
সে বিধান মেনে নিল ভক্ত পুণ্যবাণ।।

প্রস্তরফলকের প্রথম লাইনেই সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের লাইনে শেষের সংখ্যাটির কথা আগে বলা হয়। এরকম সন নির্দেশক লাইন কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আছে। সেই হিসেবে সনের হিসেবটা দেখা নেওয়া যাক।

প্রথমে সিন্ধু। সপ্ত সিন্ধু। অর্থাৎ সাত।

তারপর বিন্দু। মানে শূন্য।

তিনে নেত্র। মানে তিন।

একে চন্দ্র। অর্থাৎ এক।

এবার জিনিসটা সোজা করে লিখলে দাঁড়াচ্ছে ১৩০৭। অর্থাৎ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে, মানে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরে পদার্পণ করেন সন্ন্যাসী বালানন্দ। তিনি ছিলেন মিত্রদের দীক্ষাগুরু। শিষ্যদের নিয়ে এই মন্দিরে এসে বলিদান দেখেন তিনি। বেদনার্ত হয়ে বলি বন্ধের বিধান দেন। মিত্ররা গুরুবাক্য মেনে নেন। সেই থেকে এই মন্দিরে আর বলি দেওয়া হয় না।

বলিদান প্রথা বন্ধ হলেও জয় মিত্রের কৃপাময়ী মায়ের নিত্য পূজায় কোনও ছেদ পড়েনি আজও। ১৭৪ বছর আগে স্থাপিত এই মন্দির আজও নিয়ম করে খোলা বন্ধ হয়।

এই মন্দিরে এসেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও। বরানগর আলমবাজার মঠ গ্রন্থে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখছেন, "বরানগর হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পথে বরানগর থানার উত্তরে হরকুমার স্ট্যান্ডের উত্তরসীমায় জয় মিত্রের কালীবাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে আসিতেন।"

এখনও গভীর রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে শোনা যায় ঘুঙুরের আওয়াজ। সব সময় নয়, তবে মাঝে মাঝে। এখানে মন্দিরে পাহারা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। তবু কিছু চুরি যায় না। দু-একবার চোর এসেছিল বটে। জিনিসপত্র চুরিও করেছিল। কিন্তু চোরাইমাল নিজে থেকেই ফেলে রেখে পালিয়েছে।

'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে:

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরাঃ।।

মহাকাল সকল প্রাণীকে গ্রাস করেন। আর আদ্যা পরমা কালিকা সেই মহাকালকেও গ্রাস করেন।

মহাকালের নানা ঘাত অভিঘাত সত্ত্বেও তাই আজও গঙ্গার পূর্ব পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে জয় মিত্রের কালী মন্দির।

এবং কলকাতার কালী পুজো।

গল্প

রুমেলা

দেবদাস কুণ্ডু

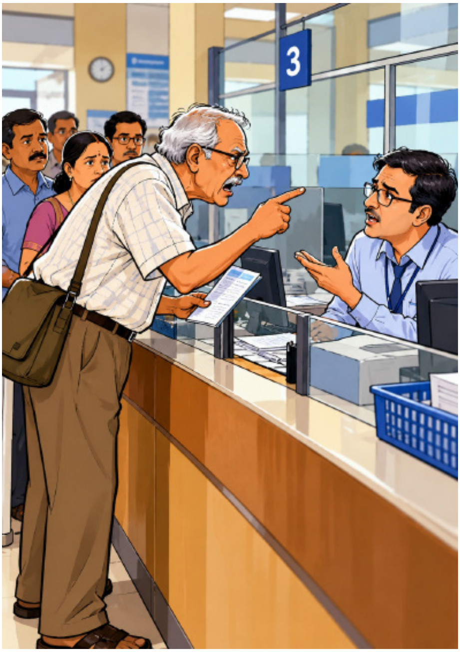

এ এক ষড়যন্ত্র। নিখাদ ষড়যন্ত্র। 60 বছর পেরিয়ে আসার পর এই ধরনের কাণ্ডকারখানা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি হতে পারে?

আজ যখন রিপোর্ট আনতে যাচ্ছি তখন মাঝপথে মনে হলো ঠিক রশিদটা এনেছি তো? কারণ আজকাল কিছু কিছু জিনিস খুব ভুল হচ্ছে। কেউ রাস্তায় বললেন- কেমন আছেন দেবদাস বাবু? আমি মৃদু হেসে বললাম— ভাল। আপনি? তিনি বললেন— মোটামুটি! লোকটি চলে গেল। অনেকটা সময় ধরে ভাবতে বসেও উদ্ধার করতে পারলাম না লোকটা কে? তার নাম কি? কোথায় থাকে? কখন কবে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?

গত পরশু এক কাণ্ড ঘটেছে। বিবেকানন্দ মোড় । আচ্ছা সে গল্প না হয় পরে বলা যাবে। এখন মূল গল্পে আসি।

কাগজটা বের করে দেখলাম। না, ঠিক কাগজ এনেছি । এক্সরে রিপোর্টের ক্যাশ মেমো, ডান পা টায় চোট লেগেছিল। ঘরে বসেই চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। নিজে

নিজে উঠতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। গিন্নিকে ডাকলাম, গিন্নি ধরে তুললে, সেই সঙ্গে কড়া গলায় বললেন- তোমাকে কতদিন বলেছি ধ্যান করো বিছানায় বসে। চেয়ারে বসে ধ্যান করলে একদিন বিপদ হতে পারে। হাত পা ভাঙবে। হল তো শিক্ষা। এখন দেখো কোথায় চোট লেগেছে?

গিন্নিদের কাছ থেকে সিমপ্যাথি প্রথম যৌবনেই পাওয়া যায়। তখন সে গিন্নি থাকে না, থাকে বউ। একটু ব্যথা লাগলে ছুটে এসে সহানুভূতির বন্যা বইয়ে দেয়। সেই বউ যখন গিন্নির পদে প্রমোশন পায় তখন সহানুভূতির বদলে তিরস্কার গঞ্জনা উপেক্ষা ভর্ৎসনা সব বড় বড় পুরস্কারের মালা দিয়ে ভূষিত করে। সেই মালা অসহ্য হলেও পরতে হয়। সইতে হয়। তা যাক সে কথা। এ বহু পুরন চিত্র।

তা পরের দিন ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম ডান পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হচ্ছে হাঁটতে গেলে।

অর্থোপেডিক অঞ্জন চট্টরাজকে দেখাতে গেলে ৮০০ টাকা ভিজিট। এত টাকা কোথায় পাব? সরাসরি চলে গেলাম সেবা সদন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। গতকাল এক্সরে করে আজ রিপোর্ট আনতে যাচ্ছি। রশিদটা ভালো করে দেখতেই রাগ চড়ে গেল মাথায়। একবার মাথায় রাগ চড়লে সুদর্শন চক্রের মত মাথাটা ঘুরতে থাকে অনেকক্ষণ।

সেই রাগ নিয়ে ঢুকলাম সেবাসদনে। রশিদটা কাউন্টারের টেবিলে রেখে বললাম- এই রশিদটা কে লিখেছে? কাউন্টারের লোকটা রশিদটা ভালো করে দেখে বললেন- আমি লিখেছি।

— আপনি কত দূর পড়াশোনা করেছেন?

— অবান্তর প্রশ্ন করছেন কেন? লোকটার গলায় একটু উষ্ণতা ঝড়ে পড়ল। কোন অবান্তর প্রশ্ন করছি না। যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করছি। আগে বলুন আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

— আপনাকে বলতে যাব কেন? লোকটি বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

— আপনি এখানে কি লিখেছেন দেখুন তো একবার। লোকটি ভালো করে রশিদটা দেখে নিয়ে বললেন- দেবদাস রায় ভালো কথা। দেবদাস বানানটা কি লিখেছেন?

— ডিইভ ডিএএস...

—তাইতো জিজ্ঞেস করলাম আপনি কত দূর পড়াশোনা করেছেন? দেবদাস বানানে কখনো ভি হয়? বি হয়।

লোকটা গলায় জোর দিয়ে বললেন - বি লেটারটা ভুল। বিবেকানন্দ বানান ভি দিয়ে লেখে।

— বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাকে তুলনা! উনি মহাপুরুষ। ওনার কথা বাদ দিন। এবার আমার রাগ চারগুন বেড়ে গেল। মাথা থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। বললাম

- আমার স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে বি লেখা আছে। সেটা ভুল? লোকটা জোর গলায় বললেন— অবশ্যই ভুল... আচ্ছা আপনি বলুন তো কোথায় আপনি ভি দেখেছেন? -

— মহারাষ্ট্রের লোকেরা ভি লেখে।

— মহারাষ্ট্র! এটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখানে তো মহারাষ্ট্রের ভাষা চলবে না। আপনার উচিত ছিল মহারাষ্ট্রে গিয়ে চাকরি করা। এখানে পড়ে আছেন কেন? আবার বলছেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির বানানটা ভুল!

— আমি কোথায় চাকরি করব না করব তার জবাব কি আপনাকে দেব?

— আলবাৎ দেবেন। আপনি আমার নামের বানান ভুল লিখেছেন আবার তর্ক করছেন? খুব সাধারণ একটা নাম তার বানান ভুল! আপনি ইচ্ছে করে মহারাষ্ট্রের ভাষা বাংলায় ঢোকানোর চেষ্টা করছেন। এটা ষড়যন্ত্র। একটা মানুষের নামের বানান ভুল মানে তার নামের উচ্চারণ ভুল। দেবদাসকে আপনি দেভদাস করেছেন। কত বড় অসম্মান! এটা আপনি বুঝতে পারছেন?

— এত কথা না বলে আপনি রিপোর্ট নিয়ে যান।

— আজ আপনি একটা লেটার পাল্টে দিয়েছেন, আপনার মত অশিক্ষিত আর একজন আর একটা লেটার পাল্টে দেবে। শেষ পর্যন্ত আমার ৬০ বছরের পুরনো নামটা পাল্টে যাবে। আপনার এই রিপোর্ট নিয়ে যদি আমাকে অপারেশন করতে হয় আমার বীমায় তো ভি নেই। বীমা কোম্পানি এই রিপোর্ট একসেপ্ট করবে না। এটা একটা ষড়যন্ত্র। আমি এই রিপোর্ট নেব না। নতুন করে এক্সরে করে সঠিক বানানে রিপোর্ট লিখে দেবেন।

— দাঁড়ান দাঁড়ান.. লোকটা চলে গেল ভিতরে। সঙ্গে নিয়ে এলো একটা মধ্যবয়স্ক লোক। তিনি পুরো ব্যাপারটা শুনে বললেন- আমাদের ভুল হয়েছে স্যার ক্ষমা চাইছি। আপনার রিপোর্টে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়নি।

— কিন্তু আপনার এই ক্লাকটি বলছেন- আমার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ভুল বানান লিখেছে। সঠিক বানানে বি হবে না। উনার তো ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হওয়ার কথা।

— কি যে উল্টোপাল্টা কথা বলছেন স্যার? আমি কখন বললাম এসব কথা?

— একটু আগেই আপনি এই কথা বললেন,এখন ভুলে গেলেন! আপনি তো বড় অসভ্য!

— আপনি অসভ্য। আপনি অশিক্ষিত। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

— আমি অসভ্য? আমি অশিক্ষিত?

— নির্মলবাবু আপনি শান্ত হন। ভুল আপনি করেছেন। আবার গলা তুলে চিৎকার করছেন। ক্ষমা চান।

লোকটা কাউন্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ভিতরে। আমি ছুটে গিয়ে লোকটার ডান হাতটা ধরে কাউন্টারে বাইরে নিয়ে আসি। বলি- মুখ সামলে কথা বলবেন, পাগল তো আপনি। না হলে বলেন কেন ইউনিভার্সিটি ভুল। যান আজই সাইক্রেটিক দেখিয়ে আসুন।

আমি বেরিয়ে আসছি। মধ্যবয়স্ক লোকটি ছুটে এসে বললেন- প্লিজ আপনি রিপোর্টটা নিয়ে যান।

— ভুল মানুষের রিপোর্ট আমি কেন নেব?

দুই

আমার এক বন্ধু বলেছিল - এখন বউ নেই। বাইরে পোস্টিং আছে তাই তোমার নিঃসঙ্গ লাগছে। যখন রিটায়ার করবে সারাদিন ঘরে থাকবে। তখন দেখবে অশান্তি হচ্ছে খুব। অশান্তির চেয়ে নিঃসঙ্গতা ভাল। এখন দেখছি বন্ধুর কথাটাই ঠিক। গতকাল ঝগড়া করে চলে গেছে অরুনাচল সারদা মঠে।

রান্নার মাসি বলল-গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। গ্যাস বুক করে দিন।

এবার আমি সমস্যায় পড়ে গেলাম। গ্যাস বুক করে স্ত্রী। মেয়েকে দিয়ে জানালাম স্ত্রীকে। পরে স্ত্রী জানাল অরুনাচল থেকে গ্যাস বুক হচ্ছে না।

গ্যাসের অফিসে এক কোনে কাজ করছে এক বাঙালি মহিলা। তাকে বললাম- আমার মৌবাইল নম্বর চেঞ্জ করতে হবে।

তিনি আমার মোবাইল নাম্বার রেজেষ্টি করে বললেন- চারশো টাকা দিন।

দিলাম চারশো টাকা। গ্যাসের অফিসে আসার আগে বইটা খুলে দেখলাম আমার নামটার মাঝখানে স্পেস আছে। Deb-das দেখে তো আমার মাথা গরম হয়ে গেল। স্ত্রী ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করে। এই ভুলটা এতোদিন দেখেনি? মাথায় রাগ চড়ে গেল। সেই রাগ এখন মাথায় ধিকি ধিকি জ্বলছে। মহিলাকে প্রবলেমটা বললাম। তিনি বললেন-কারেকশন করতে একটা ডকুমেন্ট লাগবে। আর পাঁচশো টাকা লাগবে।

— ভুল করলেন আপনারা আর আমাকে পাঁচশো টাকা গুনেগার দিতে হবে।

একটা ছোটখাটো ঝগড়া বেঁধে গেল। অন্যান্য স্টাফরা এসে আমাকে বাইরে বের করে দিল। রাগে গজ গজ করতে করতে উঠলাম বাসে। স্ত্রীর ওপর রাগ হল। এও এক ষড়যন্ত্র। প্রথমে নামে ভুল। এখন নাম দ্বিখণ্ডিত। দেশভাগের মতো। এরপর কি হবে?

তিন

দেবাশীষ রায় নামটা শুনে আমার মাথায় গ্যাস ওভেনের লাল আগুন জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা শরীরে। এরা কত দূর লেখাপড়া করেছে? এরা আবার চিকিৎসা জগতের সঙ্গে জড়িত। এখানেও একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষের নাম পাল্টে দিচ্ছে!

কিছু দিন আগে শ্যামবাজারে এক চশমার দোকানে চোখ দেখিয়ে ছিলাম। তখন ডাক্তার বলেছিলেন-ছানি পড়েছে। অপারেশন করতে হবে।

দ্বিতীয় অপেনিয়ন নেবার জন্য এখানে চোখ দেখাতে এসেছি।

— দেবাশীষ রায়।

স্ত্রী বললেন-তোমার নাম ডাকছে তো। ওঠো।

— ওটা আমার নাম নয়। এটা তুমি ভালো করে জানো।

— আরে দেববাসকে দেবাশীষ ডাকছে ভুল করে। ওঠো তো তুমি।

— ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র! এখানেও ষড়যন্ত্র।

কে ঢুকিয়েছে তোমার মাথায় এই মন্ত্র?

— এটা তোমার জপের মন্ত্র নয়। চুপ করো। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। এখানে আমি দেখাবো না।

চার

ব্যাংকটা ছোট হয়ে গেছে। আগে বড় ছিল। দুতিনটি ব্যাংককে ম্যাচ করে একটা ব্যাংক করছে। এখন একটাই কাউন্টার। টাকা তোলা আর জমা দেবার। আগে আলাদা আলাদা কাউন্টার ছিল। ক্লাকটি সকলের চেক জমা নিয়ে এক এক করে নাম ডাকছে। আমি ছোট্ট সোফায় বসে মোবাইল ঘাটছি।

— দেবাশীষ রায়। নামটা শুনে মাথায় রক্ত উঠে গেল। এখানেও সেই অবস্থা। রাগ নিয়ে কাউন্টারে গিয়ে বললাম-দেখুন তো দেবাশীষ না দেবদাস রায় আছে।

কাউন্টারের ছেলেটি ভালো করে দেখে বলল-ও সরি। দেবদাস রায়। নিন চেকের পিছনে সই করুন। ভুল হয়ে গেছে।

— এমন ভুল কেন হবে? আপনি তো পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছেন। একটা সহজ সরল নাম পড়তে ভুল হবে কেন?

— আপনি কি বলতে চাইছেন?

— পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন তো। তার মানে আপনি পড়াশুনা করেছেন।

— আপনি কি আমাকে অশিক্ষিত ভাবছেন নাকি? ছেলেটি কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে আমার মুখোমুখি।

— যাক তাহলে আপনি বুজতে পেরেছেন। আমার গলায় তপ্ত আগুনের মতো রাগ ঝরে পড়ছে।

— আপনি আমাকে অসন্মান করছেন। ছেলেটির গলায় রাগ।

গলা তুলে উচ্চ স্বরে আমি বললাম— প্রথমে আপনি আমাকে অসম্মান করেছেন। আপনার বাবার নাম যদি কেউ ভুল বলে আপনি মেনে নেবেন?

— সে যদি নামটা না জানে মেনে নেওয়া যায়।

— কিন্তু আপনি তো আমার নামটা দেখতে পাচ্ছেন। চোখে তো চশমাও রয়েছে। তারপর ভুল হয় কী করে?

— এতে হয়েছেটা কি? কত টাকা ক্ষতি হয়েছে আপনার?

— ক্ষতি! ক্ষতির চেয়ে বড় কিছু হয়ে গেছে। কেউ আমার নাম ভুল ডাকলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

ছেলেটি বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন। এবং সমস্যা মেটালেন।

মাথায় রাগ নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে অস্থির লাগছে। প্রচন্ড গরম অনুভব করছি। সামনে একটা এসি কফিশপ আছে। সেখানে ঢুকে একটা কোল্ড কফির অর্ডার দিলাম।

— দেবাশীষ এই দেবশীষ

কে ডাকল এখানে! ডাকটা পিছন থেকেই এল মনে হল। পিছনে ঘুরতে যাকে চোখে পড়ল তাকে দেখে চমকে উঠলাম। অস্ফুটে বেরিয়ে এল-রুমেলা তুমি!

রুমেলা মৃদু হাসল।

এবার আমি রুমেলার মুখোমুখি বসলাম। বললাম- তুমি এখানে কেন?

— একটা কাজে ইন্ডিয়ায় এসেছি। ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগাভাগি ব্যাপারে। এই সামনের ব্যাঙ্কে মার একটা একাউন্ট ছিল। আজ ক্লোজ করতে এসেছিলাম। ইতিমধ্যে দুজনের ঠান্ডা কফি এসে গেছে। দুজনেই কফিতে চুমুক দিল।

— কেমন আছো তুমি? রুমেলা বলল।

— ভালো। আর তুমি কেমন আছো?

— বেশ আছি। আমেরিকার মতো দেশে কেউ খারাপ থাকে নাকি? আচ্ছা দেখলাম একটু আগে ব্যাঙ্ক কর্মীটি তোমাকে দেবাশীষ নামে ডাকতে তুমি ভীষণ রেগে গেলে। এক চোট ঝগড়া করলে। মার একাউন্ট ক্লোজ করতে তখন আমি ওই ব্যাঙ্কে ছিলাম। আমিও তো তোমাকে দেবাশীষ নামে ডাকলাম কিন্তু তুমি তো রেগে গেলে না?

— কেন রাগবো? কফিতে আর একটা চুমুক দিয়ে বললাম- তোমার ডাকের ভিতর রয়েছে প্রেম,পুরনো ভালবাসা,মধুরতা। তোমার ডাকে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যৌবনের দিনগুলো এসে ভিড় করল চোখের সামনে। বুকের ভিতর সুখের ঢেউ সমুদ্র হয়ে নেচে উঠল। সে ডাক দেবদাস হতে পারে দেবাশীষ হতে পারে এমন কি শারুখ খান হতে পারে।

রুমেলা কি বলবে? মোহিত হয়ে প্রাক্তন প্রেমিককে দেখতে থাকল। দেখতেই থাকল। এতোটা ভালোবাসা এখনো আছে? তবে কি এই পৃথিবীতে একটা জিনিসই অফুরন্ত? কফিতে চুমুক দিতে ভুলে গেল রুমেলা। ভুলে গেল বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। ভুলে গেল সে বিদেশে থাকে। তার স্বামী আছে। তার ছেলে আছে। সম্পত্তি ভাগাভাগির মিটিং আছে। সব সব ভুলে গেল। সব কিছু গন্ডগোল করে দিল দেবাশিস।

গল্প

বাতাসে বিষের গন্ধ

সপ্তদ্বীপা অধিকারী

জীবনে সমস্তকিছু মানিয়ে নেওয়াই মানুষ, সাপ আর আরশোলার বৈশিষ্ট্য। মানিয়ে নেওয়া নিজের অজান্তেই এক ধরণের প্রতিস্পর্ধী শক্তি তৈরি করে। এইজন্যই পৃথিবীতে এই তিন ধরণের প্রাণীরাই রাজত্ব করছে। অথচ একজন মেরুদণ্ডী প্রাণী অন্যজন তা নয়। মাটির বুকে বুক পেতে দিয়ে সে এঁকেবেঁকে চলে। ঠিকঠাক মতো চোখেও দেখতে পায় না! খালি দাঁতে তার বিষ। আর অন্যে পাখি না হয়েও উড়তে পারে। যে কোনো ক্ষুদ্রতম ফাঁক-ফোঁকরে চাপ খেয়েও দিব্যি বেঁচে তো থাকেই উপরন্তু ওইরকম ফাঁকফোঁকরে বংশবিস্তার করতেও ওস্তাদ ।

এই মানিয়ে নেওয়াতে মাথা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে-ই তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করে। সেই মাথারও ভুল হয়। হয় শর্ট সার্কিট!

আমাদের এই গল্পের নায়কের মতো সুন্দর ছেলেটার গুণেরও শেষ নেই। তার বউটিও দারুণ রূপবতী। তাদের যমজ সন্তান। সেই দুজনও স্বর্গের দেবদূত যেন বা! তাদের অর্থেরও অপ্রতুলতা নেই। তবে এইমুহূর্তে তাদের একজন "মানুষের" বড্ড প্রয়োজন! এই বিদেশে সাহায্যকারী মানুষের বড্ড অভাব। যদিওবা পাওয়া যায় তার চাহিদা আকাশ ছোঁওয়া!

অর্কপ্রভ উপায়ান্তর না দেখে তাদের গ্রামের বাড়িতেই ফিরে এলো। গ্রামের বাড়ি মানে উত্তর চব্বিশ পরগণার একটি গ্রাম। এই গ্রামেই সে জন্মেছে। যদিও এখন অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে সেই গ্রামের। কিন্তু সে যখন ছোটো ছিল, তখন তাদের গ্রাম আরও গ্রাম্য ছিল। আরও সহজ-সরল ছিল জীবন। তার ছোটোকাকা থাকে এখন এই বাড়িতে। কাকিমাও গ্রাম্য বধূ। গ্রামের রাস্তায় তাদের আজকাল অটো এবং টোটো চলে। ভাবলেও কেমন অবাক লাগে তার। ছোটোবেলায় সে এই রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটেই স্কুলে গেছে। অবশ্য তখন মাটির রাস্তা ছিল। বর্ষাকালে হাঁটু অবধি কাদা জমে থাকত। খুব কম ছেলেরাই তখন স্কুলে যেতো। স্কুলে যাওয়া যেন বড়োলোকেদের এক ধরণের বিলাসিতা বলেই ভাবত সব্বাই। মেয়েরা তো আরও কম যেতো।

অর্কপ্রভ আসার আগে সব কথাবার্তা বলেই এসেছিল। এত ছুটি তো নেই ওর। তাছাড়া আদ্রিজার শরীরটাও ঠিক নেই। তাদের কানাডায় কাজের লোক মোটেই পাওয়া যায় না! আর পেলেও যা মাইনা চায় তা অসম্ভব বেশি। এমনিতে ঠাণ্ডার দেশ। আর ওই যমজ দুই সন্তান নিয়ে আদ্রিজার নাজেহাল অবস্থা। সিজারিয়ান বেবি। আদ্রিজাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে বেশ কিছুদিন। এক গাদা টাকা দিয়ে সে একজন দক্ষ সাহায্যকারী রেখে এসেছে ঠিকই। আদ্রিজার মাথাতেই সেদিন ভাবনাটা এসেছিল। সে-ই বলেছিল—"তুমি বরং দেশ থেকে একটা মেয়ে নিয়ে এসো। বাচ্চার স্কুলে যাওয়া অব্দি দেখাশোনার লোক লাগবে চব্বিশ ঘণ্টা। ততদিন এত্তো টাকা দিতে পারবো না!"

অর্কপ্রভও কথাটা লুফে নিয়েছে। গ্রাম থেকে একটা মেয়ে যদি সে নিয়ে আসতে পারে সামান্য টাকাতেই ভীষণ খুশি হবে সেই মেয়ে। আদ্রিজা ঠিকই বলেছে।

অর্কপ্রভ সাথে সাথে কাকুকে ফোনে সব জানায়। কাকুই কোনো গ্রামের দুক্তি নামক একটা মেয়ে দেখে কথাটথা বলে রেখেছে। তবে অর্কপ্রভকে তাদের বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবার সাথে কথা বলে তবে মেয়েটিকে নিয়ে আসতে হবে।

অর্কপ্রভ সেই মতোই এসেছে। যেদিন এসেছে সেদিন আর যেতে পারল না সে। খাওয়া-দাওয়া করে কাকু-কাকিমার সাথে কথা বলতে না বলতেই দিন শেষ। সেদিনটা চলে গেল। পরের দিন সকালে অর্কপ্রভকে যেতে হবে মেয়েটাকে আনতে। কাকু একখানা কাগজ এগিয়ে দিল। সেখানে মেয়েটার নাম, ঠিকানা লেখা আছে। তাদের গ্রামের

নাম নিশিসূর্য। বেশ কয়েক মাইল দূরে ক্যাওরাদের পাড়া। সেখানেই আছে ওই মোহন কায়পুত্রের বাড়ি। তারই মেয়ে দুজ্ঞি। এই দুজ্ঞিকেই নিয়ে যেতে হবে।

অর্কপ্রভর কেমন যেন লাগল। মনে হলো তার মাথা কিছু মনে করতে বলছে! আবছা আর হালকা কিন্তু তীব্র একটা অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। সে অনুভূতির চোখ-কান সব আছে! সে যেন কিছু বলল। আর অন্য কেউ যেন জোর করে কারোর গলা টিপে কিছু সত্য গোপন করছে! সত্য বাতাসের মতো উড়ছে যেন বা! অর্কপ্রভ অবাক হলো। ভাবল তবে কি সেইসব ভুলে যাওয়া অতীতের শৈশব শেষ হয়ে যায়নি? বেড়েছে সে ধীরে ধীরে?

অর্কপ্রভ যখন সেই কাগজ দেখে দেখে মোবাইলে সমস্তটুকুই টাইপ করে লিখছিল তখন তার কাকু বলল—"কী ভাবছিস?"

অর্কপ্রভ বলতে পারল না কিছু।

তবে এইটুকু বুঝল যে, তাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এই গ্রামে তার বেশিদিন না থাকাই শ্রেয়।

সে গাড়ি স্টার্ট দিল। কাকু বলল— "মনে রাখিস ওদের গ্রামের নাম নিশিসূর্য। মোহন কায়পুত্রের বাড়ি।"

অর্ক গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরালো।

কাকু বলল—"সাবধানে যাস।"

অর্ক মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে একবার আকাশের দিকে চাইল। আকাশের মুখটা গোমড়া মনে হল। সে একটু স্পীড বাড়িয়ে দিল। তাদের গ্রামে আজকাল আর মাটির রাস্তা নেই। কিন্তু পাশের গ্রাম থেকেই শুরু হয়ে গেছে কাঁচামাটির রাস্তা। এক্কেবারে ধুলো মাখা। অর্ক গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে এসিটা চালিয়ে দিল। লো ভল্যিয়ুমে গান চালিয়ে দিল। বেশ খানিকটা যাবার পর তার মনে হল বাইরে মনে হয় ঝড় উঠেছে। ধুলো উড়ছে। সে আরও জোরে গাড়ি ছোটাতে চাইছিল যখন, তখনই ঝড়ের অবস্থা দেখে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। সামনে একজনকে গাড়ির কাচ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল— "দাদা, নিশিসূর্য গ্রামটা আর কতদূর?"

গ্রাম্য লোকটা বলল—"নিশিসুজ্যি গাঁয়ে যাবা? তা তুমি তো উলটো দিকি চ্যলি এইয়েচো...!"

চমকে উঠল অর্ক!

—"মানে?"

সে কয়েকঘণ্টা গাড়ি চালিয়েছে। এতোটা পথ সে উলটো এসেছে?

গ্রাম্য সরল মানুষটি বললে— "এই পত দে পিচোন পানে দু কোরোশ গিলি এট্টা

বড়ো ফজলি আম বাগান পড়ব্যানি। ডান হাতি বাগানডা রেকি সুমকি এজ্ঞে গিলি নিশিসুয্য গাঁয়ে যাতি পারবা।”

অর্ক অবাক হয়ে বলল— “আপনি ঠিক জানেন?”

ততক্ষনে আরও কয়েকজন দেহাতি মানুষ এসে পড়েছে ওই পথে। বেশির ভাগই মহিলা। তাদের হাতে বেতের ফুলদানিতে ফুল আর কাঁসার রেকাবিতে প্রসাদ। সে বুঝতে পারল কোথাও থেকে এই মানুষগুলো পুজো দিয়ে ফিরছে। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। অর্ক প্রমাদ গুনল। তাকে এতোটা পথ ফিরে যেতে হবে এখন? সে আবার বলল—” নিশিসূর্য গ্রাম ওইদিকে?”

তখন অন্য মানুষগুলোও একই কথা বলল। অর্ক গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে আর ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে তার। এমনিতেই ধুলো বড্ড এইসব মাটির রাস্তায়। গাড়ির কাচগুলো ভালো করে তুলে দিয়ে অভ্র জোরে গাড়ি ছোটালো। বেশি রাত করা যাবে না। রাতে এইসব গ্রাম্য এলাকায় মানুষজন থাকে না রাস্তায়। তাছাড়া ফিরতেও হবে তাকে দুজ্জিকে নিয়ে। কী যেন তার বাবার নামটা...! অভ্র স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতেই মোবাইলটা খুলল। নামগুলো সে লিখে নিয়েছিল তো। নিশিসূর্য আর দুজ্জি এই নামদুটো মনে আছে তার। ফেরার টিকিট করার সময়ই জেনেছিল। পাসপোর্ট করার সময়েও নাম লিখেছিল বটে। কিন্তু দুজ্জির বাবার নামটা মনে নেই। মোবাইল খুলে দেখে নিল। মোহন কায়পুত্র! ঠিক আছে! একদম হঠাৎ কোথায় যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল! কড়াৎ করে বাজ পড়ল যেন কোথাও!

অভ্র বলল— “এহহে, আজই ঝড় উঠতে হল! উফফফফ!”

বড্ড বিরক্ত হয়ে সে গাড়ি ছোটাতে লাগল। যেতে যেতে শোঁ শোঁ আওয়াজে ঝড় উঠল। অভ্র বুঝতে পারল যে, গতিক সুবিধের নয়। বাতাস কি কথা বলে? তার যেন মনে হচ্ছে কেউ কিছু বলছে!

অর্ক স্টিয়ারিং জোরে করতেও পারছে না! বাড়ি ফেরার কথা তো ভাবাই যায় না এখন। ওই দুজ্জিকে নিয়ে তবেই ফিরবে সে। আর সেটা আজই করতে হবে। ভাবল সে। তাকে যে ভাবেই হোক দুজ্জির বাড়ি পৌঁছাতেই হবে। কালকের বিকেলের ফ্লাইটের টিকিট কাটা আছে তার আর ওই দুজ্জির। সুতরাং আজ ওই দুজ্জিকে না নিয়ে ফিরতে পারবে না। এদিকে গাড়ির বাইরের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে না দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় কিন্তু ঝড় আর ধুলোর দাপটে গাড়ি এক সময় থামাতে সে বাধ্য হলো।

“কী ঝামেলায় পড়া গেল!”. বিড়বিড় করল সে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চলতে আরম্ভ করল। রাত হয়ে গেছে। এই অঞ্চলের মানুষজন সন্ধের পর তেমন একটা বের হয় না। আজ কোনো পুজো-টুজো আছে মনেহয় তাই ওই গ্রাম্য মহিলাদের সে দেখেছে। গাড়ি একদম হঠাৎ যেন কিসে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে

উঠল। তারপরই হুড়মুড় করে একটা গাড্ডায় পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল ওই গাড্ডা থেকে গাড়ি আর ওঠাতে পারবে না সে একা একা! অভ্র গাড়ির দরজা খুলে অনেক কষ্টে হামা দিয়ে বেরল। গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে! চারিদিকে চেয়ে দেখল একটা জঙ্গলে এসে পড়েছে সে! ফজলি আম বাগান এখানে নেই। এদিকে হুহু করে বাতাস বইছে! বাতাসের কি রাগ হয়? মুহূর্তেই সেই বাতাসের বেগ তীব্র হয়ে উঠল। সোঁ সোঁ করে ধেয়ে আসছে সেই বাতাস ঝড়ের বেগে। গাছ পালা ওলোট পালোট করে ঝড় ধেয়ে আসছে। মোবাইলের আলো জ্বেলে অভ্র নিশ্চিত হল যে, গাড়ি সে একা কিছুতেই ওঠাতে পারবে না! সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝল আশেপাশে কোনো গ্রাম-টাম নেই! মোবাইল নিয়ে কাকুকে ফোন করল। ওপারে রিং হচ্ছে। এরই মধ্যে বাতাসের পিঠে চড়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি ধেয়ে এল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মোবাইলটা ধরেছে কাকু অথবা কাকিমা। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না! তীব্রতম সোঁ সোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগার অবস্থা! বৃষ্টি আরও জোরে ধেয়ে এল।

বাতাসে কি ইতিহাস লেখা থাকে? এই প্রথম তার মনে হল যে, বাতাসের ঘ্রাণ থাকে! রাগ থাকে! তার কখনো গরম লাগছে! কখনো ঠাণ্ডা! বাতাসের স্বাদও থাকে! মুখের মধ্যে বাতাস ঢুকে পড়ছে। কখনো তা মিষ্টি , কখনো কষা, কখনো ঝাল। আবার কখনো প্রতিস্পর্ধী বাতাস বালি সমেত ঢুকে পড়ছে মুখের মধ্যে! মুখের মধ্যে কিচকিচ করছে। অভ্র ছুটতে আরম্ভ করল। সামনেই একটা বিশাল গাছের অবয়ব সে দেখতে পেয়েছে। ছুটে গিয়ে সেই গাছের তলায় আশ্রয় নিল। সে ছুটল এবং গাছের তলায় আশ্রয় নিল। কিন্তু মনে হল তীব্র ঝোড়ো বাতাসই তাকে ঠেলতে ঠেলতে এখানে এই গাছতলাতেই নিয়ে এসেছে! গাছটা এত্তো বেশি ঝাকড়া যে তলায় বৃষ্টি তেমন পড়ছে না! গাছের গুঁড়িটাও খুব মোটা। সে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সেই গাছের কোটরে সেঁধিয়ে গেল। বৃষ্টি তো বটেই, ঝড়ের হাত থেকেও অনেকখানি বাঁচা গেল! সে গাছের গায়ে নরম কিছু টের পাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় চরাচরকে ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল! আর তার থেকেও বেশি চমকে উঠল অভ্র! সে সেই বট গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে! এই গাছটাই সেই গাছটা। এই গাছটিকেই এই অঞ্চলের মানুষ পুজো করে। গাছের গায়ে লাল সুতো বাঁধে! এই সুতো বেঁধে এরা মানত করে! এই সুতোয় হাত লাগাতেই তার নরম নরম লাগছিল। কিন্তু সত্যি বলতে অভ্র এই সুতোর কমনীয়তাকে বিষাক্ত সাপ মনে করে প্রচণ্ড জোর কেঁপে উঠেছিল। এই গাছটিকে আসলেই দেবতা বলে এই গাঁয়ের মানুষেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে! আর এখানেই পুজো দেয়। আজই সেই পুজোর দিন। বিষয় এগুলো নয়!

বিষয় হল শবরী। হ্যাঁ। সেই ক্যাওরাদের মেয়েটা। অভ্রর হঠাৎ চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল! সেই সাথে সে বুঝতে পারল বাতাস ফিশফিশ করে কিছু গন্ধ ছড়িয়ে দিল। সেই গন্ধে ভেসে উঠল কত ভুলে যাওয়া কথা! অভ্রর মা-বাবা তখন বেঁচে।

ওদের বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করত শবরী বলে মেয়েটা। মেয়ে ঠিক নয়। বিধবা যুবতী। দারুণ ছিল তার দেহের গড়ন। কালো চামড়ায় ঢাকা একটা অনন্যসাধারণ দেহ-বল্লরী। অভ্র বা ওর বাবা-কাকা অত্যন্ত ভদ্র। গ্রামের সব্বাই তা জানে। হঠাৎ এক ছোঁয়াচে জ্বরে মেয়েটি তার পরিবারের তিনজনকে হারায়। একটিমাত্র ছোট্ট মেয়েকে আর তার বৃদ্ধ ঠাকুমাকে নিয়ে আতান্তরে পড়ে মেয়েটি তাদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নিয়েছিল। অভ্র যে তার সাথে এমন একটা কাজ করে ফেলবে তা অভ্র নিজেও ভাবতে পারেনি। মেয়েটার সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ ছিল। বেশ ভাল্লাগতো তার ওই অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরী। মেয়েটি হেঁটে গেলেই যেন অদৃশ্য কোনো দেবতার হাতে সেতার বেজে উঠত। হাসলে যেন ফুটে উঠত কুন্দ ফুল। আর বাতাসে সেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত! শুধু কথা বললেই তাদের সেই নোংরা আদিম জনগোষ্ঠীর ভাষার দুর্গন্ধে ছেয়ে যেতো সমস্ত অনুভূতি। আধুনিক, স্মার্ট, উচ্চ শিক্ষিত, বড়োলোক বাবার একমাত্র শিক্ষিত ছেলে অভ্রর মস্তিষ্ক চাইত ওই শবরী চিরকাল বোবা থাকুক। ওই সুন্দর ঠোঁটজোড়া যখন তাদের ক্যাওরাদের ওই বিচ্ছিরি ভাষায় কথা বলতো, তখনই অভ্রর ওকে বিরক্ত লাগতো! বিচ্ছিরি লাগতো। ওকে পুরোপুরি অনুভব করতে চাইত অভ্র। কিন্তু তাদের ভদ্র পরিবারে এই ক্যাওরাদের বিধবা যুবতীর সাথে কোনোরকম সম্পর্ক হলে মান-ইজ্জত সব যাবে। মস্তিষ্ক বোঝাল। অভ্রর পুরুষ শরীরে কামনার বান ডেকে উঠত তবুও।

সেই সময়েই একদিন। কেমন করে যে কী ঘটল! কেন যে ঘটল! এইরকম একটি দিনে অভ্র এই বটের নীচেই শবরীকে পেয়ে নিজেকে সামলাতে পারেনি। এই নির্জনে সাধারণত মানুষজন আসে না তেমন। কাঠ কুড়াতে আসে মাঝে মাঝে ক্যাওরাদের মেয়ে-বউরা। শবরীও তেমনই গিয়েছিল নিশ্চয়ই। এই বটবৃক্ষের তলেই অভ্র চেপে ধরেছিল শবরীকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও শক্ত-সমর্থ অভ্রর হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি! খুব কাঁদছিল। অভিশাপ দিচ্ছিল। অভ্রর তখন অন্য দিকে খেয়াল ছিল না। সে সম্পূর্ণ দখল চাইছিল। সে সম্পূর্ণ উজাড় চাইছিল! মেয়েটা তখন লড়াই করার শক্তি হারিয়ে নেতিয়ে পড়েছিল। আর কাঁদতে কাঁদতে বলছিল—"ওগো বটোবিক্ক সাক্কি থেকো। জেবনে কিচুই দাওনিকো মোরে! মোর সোয়ামিরি কেড়ে নেচো। কোল পোচা ছাওয়ালডারেও নে নেচো...! একোন তোমারি সুমকি মোরে বেইজ্জত করতেচে বটোবিক্ক! তুমি এর বিচের করো...!"

থামতেই চাইছে না যে এ মেয়ে! কুন্দ ফুলের সুবাসে মুখ ডুবিয়ে অভ্র তছনছ করে দিতে চাইছে তখন! মেয়েটা তখন ওই বৃক্ষকেই সাক্ষি মানছে।

ঘন দুধের উপাদেয় পায়েশ খাবার সময় দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগের মতো বিশ্রী এক অনুভূতির বিড়ম্বনায় মস্তিষ্কর আদেশে অভ্র এক হাত দিয়ে শবরীর মুখ চেপে ধরল গায়ের জোরে! তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ানো বন্ধ হল আর অভ্রর সমস্ত শরীরেই তখন শক্তি! সমস্ত শরীরই

তখন তীব্র! আগুন ঝরানোর তীব্র কামনা মিটিয়ে তারপর সে শবরীর মুখ ছেড়েছিল। হাঁফাচ্ছিল তখন অভ্র! কী যে শান্তি সে পেয়েছিল! সে জানে এই মড়া গরিব ছোটোলোকরা কিচ্ছু করবে না! ঘেমে গিয়েছিল অভ্র। খুব সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করলেও সে প্যান্টের চেন লাগিয়ে উঠে পড়ল। দেখল শুড়শুড় করে কুচো কুচো আরশোলার বাচ্চা কতোগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে শবরীর দেহের উপর। তখনো তার বক্ষ-যুগল উন্মুক্ত। সেদিকে চোখ পড়তেই অর্কর শরীরে আবার বিষাক্ত কেউটে নড়ে উঠল। সে নিজের জামা-প্যান্ট ঠিক করার ছলে নিজেকেই সামলাতে চাইল। দেখল তার শরীরেও কুচো কুচো আরশোলার বাচ্চা ঘুরছে। সে ঝেড়ে ফেলে দিল জীবন্ত জীবগুলোকে। সে কোন্ উন্মাদনায় এই নোংরাতেই, এই ঘিনঘিনে পোকাগুলোর উপরেই শবরীকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। ভালো করে ঝাড়তে গিয়ে টের পেল সেই মোক্ষম চাপেও একটাও আরশোলা মরেনি। প্রাণ-ভয়ে নাকি প্রাণের প্রমাণ দেবার জন্যই তারা উড়ে দূরে চলে গেল। জামা-প্যান্টে ধুলোও লেগেছে তার। ঝেড়ে নিয়ে তার হঠাৎ খেয়াল হল যে, মেয়েটাকে সে ছেড়ে দিলেও সে শরীরটা ঢাকছে না বা উঠছে না বা কাঁদছে না। কেন? সে মেয়েটার মুখের দিকে চাইল! "এই শবরী, রাগ করিস না!"

বলে পকেটে হাত দিয়ে কিছু টাকা বার করতে করতে ওর মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠল অভ্র! মেয়েটার নাক থেকে সামান্য রক্ত বেরিয়ে আছে! আর ও নি:শ্বাস নিচ্ছে না! সর্বনাশ! ও কি তবে মেয়েটির মুখের সাথে সাথে নাকও চেপে ধরেছিল? হায় হায়! এ ও কী করেছে? সে মেয়েটার পালস দেখল আর নিশ্চিত হল যে মেয়েটা আর নেই! কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বুঝতে পারল কী ঘটিয়েছে সে। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে মন চাইছিল তার। এ কী করল সে? ইসসস! অভ্রর চোখে জল চলে এল! কী ক্ষতি করে দিল সে একটা পরিবারের! ভাবতে ভাবতেই সে চরম ভয় পেল! আর ওর মস্তিষ্কের আদেশক্রমে ও মেয়েটাকে তারই পরণের শাড়ি দিয়ে ওই বট গাছেরই শাখার সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে! নাহ! ধরা সে পড়েনি! মেয়েটার স্বামী আর পুত্র সন্তান নেই। মনের দুখে সে আত্মহত্যা করেছে! তার পরণের কাপড়টা দিয়েই সে ঝুলছে! একবারো কারোর মনে হল না যে, নারীরা মৃত্যুর সময়েও লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রাখে না! তখন অজ পাড়া গাঁ ছিল। এখনো তাইই। তবে এখন তো হাতে হাতে মোবাইল! মানুষজনও অনেক অধিকার-সচেতন হয়ে উঠেছে! তখন কিন্তু শবরীর মৃত্যুতে কেউ কিচ্ছু বলল না। চুপচাপ পুড়িয়ে দিল শরীরটা! অভ্র অবশ্য ওর শাশুড়ি আর মেয়ের হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল।

এই ঘটনা সে ভুলেই গিয়েছিল। ভাবখানা এমনই যেন পায়ের তলায় একখান আরশোলা চাপা পড়লে কারোর কি মনে থাকে?

কোথাকার কোন্ শবরী নামে ক্যাওরাদের এক বিধবা মেয়ে!

অভ্র গাছটার দিকে তাকাল। এই অন্ধকার রাত। ঝুপঝুপ বৃষ্টি। উথাল-পাতাল ঝড়। জনমানবহীন পরিবেশ। কাকতালীয়ভাবে আজই সেই বটবৃক্ষের পুজো। আজই তাকে এখানে আসতে হল। আর সেই আর্তি যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে—” ওগো বটবিক্ক, সাক্কি থেকো। জেবনে কিচুই দাওনিকো মোরে! মোর সোয়ামিরি কেড়ে নেচো। কোল পোচা ছাওয়ালডারেও নে নেচো। একোন তোমারি সুমকি মোরে বেইজ্জত করতেচে বটোবিক্ক! তুমি এর বিচের করো।’

সেই সময় এই কথাগুলোকে তার দুর্গন্ধের মতো লেগেছিল। এ কথা সত্যি।কিন্তু এখন সেই কথাগুলো তার মনে পড়তেই সে পরিষ্কার দেখল, কথাগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে যেন ছোবল বসাতে চাইছে! মানুষ মরে যায়। অশ্রু মরে না। অশ্রু বড়ো হতে হতে আরও বড়ো হয়। অভিশাপের জন্ম হয়। সেই অভিশাপও বেঁচে থাকে। বাতাসে অক্সিজেনের মতো।

সে বটবৃক্ষের দিকে চাইল। বিশাল গাছ। কত শত বছর বয়স কে জানে? মুর্খ জাতি। এই গাছকে ঈশ্বর ভেবে পুজো করে। আবার এই গাছকে সাক্ষিও রাখে। এত্তোখানি ডাল হেডেট মানুষ হয়?

কিন্তু সে বাতাসে গন্ধ পাচ্ছে। পুরানো গন্ধ! অতীতের গন্ধ। ইতিহাসের গন্ধ। ভ্যাপসা গন্ধ। সব কিছু জমিয়ে রাখার গন্ধ।

অন্য কোনো মানুষ হলে ভয় পেতো। কিন্তু অভ্র অসম-সাহসিক। যুক্তিবাদী। সে সামান্যতমও ভয় পেলো না। একজন অত্যন্ত সাহসী পুরুষের মতো বলে উঠল—“মৃত্যু মানে সব শেষ। সব। আর গাছ কখনো ঈশ্বর হতে পারে না!”

বলতে না বলতেই আরো জোরে এল ঝড়। দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে উঠল।

অভ্র অল্প হাসল। মনে মনে বলল—“পিস্তল নিয়ে আমাকে তাক করে কেউ দাঁড়ালে আমি অবশ্যই ভয় পেতাম!”

ঠিক সেই সময়ে আরও তেজে বৃষ্টি এল। অভ্র গাছের দিকে চাইল। বলল—“বটবিক্ক, তোমার প্রাণ আছে, জানি। কিন্তু শক্তি নেই!”

বলে সে হাসল। তার কি তবে ভয় লাগছে? সে “বটবিক্ক” বলে সম্বোধন করল কেন? অবজ্ঞা? তার স্মৃতি পুরোপুরি ফিরে এসেছে। শবরীকে তার মনে পড়ছে। শবরী তখন খুব ছটফট করছিল। সে ভেবেছিল বলপূর্বক দখলে বাঁধা দেবার চেষ্টা! কিন্তু পরে বুঝেছে যে, তখন আসলে শবরীর অক্সিজেন কম পড়েছিল। মাথাটা কেমন করে যেন ঘুরে উঠল অভ্রর। সে খুনি নয়। সে পরিস্থিতির শিকার। কিন্তু নারীকে ধর্ষণও যে হত্যারই সমকক্ষ! তা সে ভাবল না একবারো। তার কী যে মনে হল। সে বটগাছের দিকে চেয়ে থাকল অনেকটা সময়। তারপর বলল— “আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি সব কিছুর

বিচারক..! হুহ! একটা গাছ, একটা গাছ মাত্র তুমি। মাটির ভিতরে শিকড় চালিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছ মাত্র তুমি... !"

সে এরপর নিজের মাথার চুল চেপে ধরল দুই হাতে।

বলল—"কিচ্ছু করতে পারবে না তুমি। কিচ্ছু না... !"

অভ্র কিছুতেই শবরীর সেই ছটফট করা আর এই গাছকে ঈশ্বরের মতো রক্ষা করতে বলা ভুলতে পারছে না। তার অনুভূতির সাথে পাল্লা দিয়েই যেন বিদ্যুৎ আর বজ্র মুহুর্মুহু চমকে উঠছে। অভ্র মাতালের মতো টলছে তখন। বলছে— "আমি ভয় পাবো না... ! কোনো বন্য জন্তু এই জঙ্গলে নেই! সুতরাং আমি কাউকে ভয়ও পাই না!"

তীব্র বেগে ঝড় বইছে তখন। ঝড়ের এমন বিষাক্ত শিসের মতো আওয়াজ আগে বুঝি কখনো শোনেনি সে!

আচ্ছা, ঝড়ের কি দাঁতও থাকে? নইলে এত্তো বিষ, এত্তো ছোবল কোত্থেকে আসছে?

ঝড় থামতে থামতে সকাল হয়ে গিয়েছিল। অভ্রর মোবাইলে সারাটারাত ফোন করে গেছে ওর কাকু। ফোন ধরেনি কেউ। ভোর হতে না হতেই গ্রামের লোকজন দেখতে পেয়েছে অভ্রকে! সে সেই বটগাছের নীচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার মাথায় বটগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে পড়েছে আগের রাত্রে। মাথা ফেটে চৌচির। রক্ত পড়েছে অনেক। মাথার চুলগুলো রক্তে ভেজা। বৃষ্টির জলের সাথে সাথে মাটি লাল রক্তেও ভিজেছে। রক্তের গন্ধে মাছি উড়ছে চারিদিকে।

গ্রামবাসীরা এই ঘটনায় বটগাছের দিকে চেয়ে আভূমি প্রণাম করল।

অভ্রর কাকা অশ্রু মুছে গাছের দিকে চাইল। ঝড়ের দাপট বহু চিহ্ন রেখে গেছে। গাছের ছোটোখাটো অনেক ডালই ভেঙে গেছে। তবে সব থেকে বড়ো আর মোটা ডালটিই অভ্রর মাথায় ভেঙে পড়েছিল। অভ্রর প্রাণ চলে যাবার সাথে সাথেই সেই বিভিন্ন গন্ধ, বিষ, অনুভূতি বহনকারী বাতাস শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!

ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবও মিটে গেছে। শান্ত বটের পাতাগুলো তখন সকালের মিষ্টি, সুখী, তৃপ্ত, সংযমী এবং স্বগতভাষণরত হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে!

নিবন্ধ

জীবনে অন্য এক দুর্গাপুজো

মহাশ্বেতা মুখার্জী

এই দুর্গা পুজো নিয়ে বাঙালির নস্টালজিয়ার আর শেষ নেই। তা আমিও তো যতোই প্যান্ট শার্ট পরে চাকরি বাকরি করি না কেন, বা অন্য শহরে চাকরি সুত্রে থাকি না কেন, দিন শেষে তো আমি ও সেই মাছে ভাতে বাঙালিই রে বাবা, তাই নস্টালজিয়ার অনুধাবন টা আমারও বেশ প্রকট হবে সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

জানেন তো জন্ম সুত্রে আমি একটি জমিদার পরিবারের মেয়ে। আমার গ্রামের নাম নারিট। যারা হাওড়া দিকে থাকেন তারা আমতা চিনবেন বা তারা জানবেন ওখান থেকে কিছুটা গেলেই আমাদের গ্রাম নারিট অবস্থিত । যদিও আমার বাবা এবং মা দুজনেই কলকাতায় চাকরি করাতে , আমার জন্ম, কর্ম ,বড় হয়ে ওঠা সবটাই কিন্ত কলকাতায়। কলকাতায় আমাদের নিজস্ব বাসভবন, সেখানে থাকতাম আমি দিদি মা আর বাবা, এই চারজনের সংসার ছিল আমাদের।

কিন্ত পরিবার আমার ছিল বিশাল। আমার ১০ কাকা ২ পিসি। এছাড়াও দাদুর অন্যান্য ভাই বোনেদের ছেলে মেয়েরাও আমাদের কাকা পিসির দলেই পড়তো। সব মিলিয়ে সংখ্যা টা ঠিক কতো তা বলতে পারবো না। আর এই পুরো গুষ্টিটা একত্রিত হতো

আমাদের বাড়ির দুর্গা পুজোর সময়। হুমম জমিদারী প্রথা এখন আর না থাকলেও, তার কিছু বিশেষ আচার অনুষ্ঠান এখনো রয়ে গেছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে।জানেন তো আমাদের বাড়িতে আজও ৩০০ বছরের পুরোনো দুর্গা পুজো হয়।

বাবা তো জন্ম থেকেই নিজের বাড়িতে দুর্গাপুজো দেখছেন। আমাদের বাড়ির পুজোর বেশ কিছু আলাদা নিয়ম কানুন আছে, যেমন আমাদের বাড়ির ঠাকুর কেনা হয় না, আমাদের বাড়ির ঠাকুর আমাদের আটচালাতে তৈরী হয়। রথের দিন কাঠামোর গায়ে প্রথম মাটি পড়ে। বাবা বলেন সে এক অদ্ভুত স্বাদ জীবনের। আমাদের বাড়ির ঠাকুর দালান, নাট মন্দির সবকিছুর মধ্যেই আজও কিরকম একটা রাজকীয় ছোঁওয়া রয়ে গেছে। কিন্তু আর সেই আগের মতো পুজোর সেই জৌলস আর নেই। সবাই কাজে কর্মে নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। এখন তো সবাই আবার দুর্গাপুজোতে ছুটিও পায় না। কিন্তু ২০ বছর আগের দৃশ্যটা এই রকম ছিল না জানেন।

এই আমার কথাই বলি না ...আমার জীবনের ১৯ টা বছর দুর্গাপূজো কেটেছে ওই গ্রামের বাড়িতে। পুজোয় বাবার অফিস ছুটি, মায়ের স্কুল ছুটি আর আমাদের ও স্কুলে পুজোর ছুটি পরলেই আমরা পঞ্চমীর দিনই দেশের বাড়ি চলে যেতাম। আর দশমীর পর, দুর্গা মায়ের সাথে আমাদের ও ঘরে ফেরার পালা হতো। বাড়ির পুজোর যে কি অমোঘ টান সেইটা আজকে বুঝি ,এই ইট কাঠ পাথরের শহরে। কারণ এখন আর ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না যে মন চাইলেই দেশের বাড়ির চলে যাবো। পায়ে এখন যে হাজার দায়িত্ব, কর্তব্য আর কাজের শিকল আটকানো। অথচ কি মজার ব্যাপার... একসময় ,ওই একটু যখন বড় হচ্ছি, মানে সময়কাল টা তখন আমার নবম কি দশম শ্রেণী হবে ,তখন যখন বন্ধুরা পুজোয় কলকাতার বিভিন্ন নামি দামী প্যানডেলের গল্প শোনাতো, তাদের সারারাত জেগে ঠাকুর দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতো, তখন যেন গ্রামের বাড়িতে বসে আমার কান্না পেত।

দুর্গাপুজোর ওই কয়েকটা দিন সারা গ্রামের লোক, বিশেষ করে পুজোর ৪ দিন ভোগ খেত আমাদের দুর্গা দালানে। গোটা গ্রামে কারোর বাড়িতে রান্না হত না। এখন ও অবশ্য তাই হয় ,কিন্তু সময় পাল্টেছে। এখন আর সবাই আসে না, তাছাড়া এখন অনেকেই কলকাতার দিকে কোন আত্মীয়ের বাড়ি থাকলে সেখানে চলে যায় । তারপর গ্রামের সেই একটাই পূজো, আর কিছু টুনি লাইট দিয়ে সাজানো রাস্তা, বাড়ির সামনে ভেপার লাইট ,এই সবই পাল্টেছে এখন । এখন পূজোর সংখ্যা গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোর জৌলস বেড়েছে, দোকানপাট বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে মানুষের মানসিকতার ও পরিবর্তন হয়েছে।

পরিবর্তন এসেছে নিজেদের জীবনেও। এই আমি যদি আমার কথাই বলি, এখন সমাজ সংসার সবকিছুর উর্ধে গিয়ে, এখন যেন কর্মই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বসে রয়েছে

জীবনে। এখন আর সেই পুজো আসার আগের মতো উত্তেজনা নেই, ছুটির আমেজ নেই, সপিং এর মজা নেই, সেই জায়গা গুলো এখন দখল করে নিয়েছে- পুজোর আগে বিভিন্ন শারদ সংখ্যায় নিজের লেখা দেওয়ার ডেডলাইন, পুজোর সময় পুজো পরিক্রমার সিডিউল, আর পুজো নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে পডকাস্ট, কোনটিতেই না করার জায়গা নেই। কারণ নিজের পরিচিতির গন্ডি বাড়াতে কম কষ্ট করতে হয়নি তো নিজেকে। আর আজ যখন মানুষ দু-হাত ভরে ,আশীর্বাদ করছে, ভালোবাসা দিচ্ছে ,তখন সেইগুলোকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই। আজ এইটাই আমি, সকাল থেকে অফিস, তারপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেখান থেকে বাড়ি ফিরে রাত্রিরে লেখালিখি। আর এরমাঝে তো সংসারের দায় দায়িত্ব, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সেই সব কিছুই রয়েছে। কোন জায়গাতেই "না" বলার উপায় নেই। আজ বুঝি নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদে কখন যে মানুষ থেকে যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেলাম তা টেরও পেলাম না। ফল স্বরূপ মানুষের এক্সপেকটেশন বেড়েছে, আর তার দাম দিতে গিয়ে শরীর একদিন হাল ছেড়েছে।

সেই হসপিটালের বেডে মারাত্মক যন্ত্রণা বুঝিয়েছে শুধুই ছুটে চলার নাম জীবন নয়, কখনো কখনো একটু থামো, একটু নিজের জন্যও বাঁচো। একটা মারণ রোগ শিখিয়েছে, কি করে নিজেকে দাম দিতে হয়? কখন একটু থামতে হয়? কখন নিজের জন্য সময় বার করতে হয়, আর সবথেকে ইমপর্টেন্ট কি ভাবে "না"বলতে শিখতে হয়। জীবন প্রবাহমান, সে কারোর জন্য থেমে থাকেনা, তুমি ছাড়াও সবার সব দ্যিব চলে যাবে, তাই তোমাকেই নিজের জীবনের প্রায়োরিটি চুজ করতে হবে। তোমাকে জানতে হবে, কোথায় থামতে হয়, কখন দৃঢ়ভাবে "না" বলতে হয়, তবেই তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। তোমার জীবনের কষ্ট তোমার, তোমার জীবনের আনন্দ তোমার, তাই তোমার নিজের মূল্যায়ন ও তোমাকে নিজেকেই করতে হবে। সমাজ সংসার গোটা পৃথিবী, সেই ভাবেই তোমাকে চিনবে, যে ভাবে তুমি নিজেকে চেনাবে। তাই অজথা নিজের স্ট্রেশ বারিয়ে, অন্য কে খুশি করার কোন দরকার নেই। এই সব কথাগুলোকেই নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি বলেই আজ নিজের সাথে নিজে গল্প করার সুযোগ পাই।

না নিজের কোন পরিচয় থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করিনি, কোন কাজ থেকেও নয়,শুধুমাত্র অতিরিক্ত প্রত্যাশা পূরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছি। এখন সবকাজই করি ,কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত করে নয়, বা বলা ভালো সময়ের সাথে নিজেকে সেট করতে শিখছি ,তাই এখন আর সময়ের ঘাটতি হয় না,কারণ এখন আর সময়ের থেকে আগে দৌড়াই না তো, বা সময়কেও ইলাসট্রিকের মতো টেনেও বাড়াতে চাই না, অতিরিক্ত কাজের জন্য। বরং সময়ের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে সুন্দর করে বাঁচতে শিখেছি। তাই এখন যখন মাঝেমধ্যে নিজের সঙ্গে নিজে ডেটে যাই, তখন ফিরে যাই সেই ছোট্ট বেলার গ্রামের বাড়িতে।

আজ পুজো পরিক্রমায় বেরোলে যখন আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সেরা প্যানডেল, সেরা প্রতিমা, এইসবের নাম্বার দিতে দিতে ,কখন যেন মন চলে যায় আমার নিজের বাড়ির একচালা ঠাকুরের, ডাকের সাজের প্রতিমার কাছে, বুঝতেই পারি না। আর মনটা তখন অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে উঠে। শহরের বাইরে যাই যখন, তখন গাড়িতে বসে বসে মনের মধ্যে ভিড় করে আসে, সেইসব অজস্র স্মৃতি যে গুলো আজ এই বর্তমান গতিশীল জীবনে যেন অমৃতশুধা। মনে পড়ে, সেই বয়ঃসন্ধির প্রথম প্রেম। আমাদের সময় দূর্গাপূজোয় প্রেম যে কি রোমাঞ্চকর ছিল, তা আমরাই জানি। এতো স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ তখন ছিল না। ছিল বছরে একবার দেখা করার প্রতীক্ষা, অষ্টমীর শাড়ি পরার আনন্দ, আর অঞ্জলি দেবার সময়, সকলের চোখ এড়িয়ে প্রেমিকের পাশে দাঁড়ানোর উত্তেজনা। ছিল পুজোর কটা দিনের সেই লুকিয়ে চিঠি দেবার আনন্দ, লুকিয়ে দেখা করার আস্বাদ, আর পুজো শেষে ফিরে আসার মনখারাপ।

কী অমূল্য ছিল সেইসব অনুভূতি তা আজ বুঝি। এতো সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য, কতকিছু কেড়ে নিয়েছে আজ মানুষের জীবন থেকে। সুখ,শান্তি, আত্মতৃপ্তি, আজ আর কিছুই নেই, আছে শধু দৌড়ে চলা, কমপিটিশান, সো অফ, আর এক নাম না জানা লড়াই, যেখানে সবাই সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে ব্যস্ত, আর এইভাবেই কখন যে দিন ফুরিয়ে আসছে, জীবনের আলো নিভে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছে না মানুষ, তাই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে শূন্য হাতে।আমরাই বোধহয় সেই শেষ জেনারেশন যারা জীবনের প্রত্যেকটা অধ্যায়কে অনুভূতির সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পেয়েছি।

একবার মনে আছে, দেশের বাড়িতে পুজোর সময় গেছি, হঠাৎই লক্ষ্য করি আমাদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের কেউ হবে, ওই বছর ১৯-২০ একটি ছেলে, আমাকে খুব দেখছে। শুধু দেখছে বললে ভুল বলা হবে, বলা ভালো ফলো করছে। আমি তখন ওই ১৪/১৫ হবো। বেশ ভালোও লাগছে, আবার ভয় ও করছে, যদি কেউ কিছু বুঝতে পারে।

ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ ভালোই ছিল। আমারও বার বারই চোখ যাচ্ছে তার দিকে। ওই বয়সের স্বভাব যা। তা এইভাবেই কেটে গেল গোটা একটা দিন, আনন্দ, আশঙ্কা আর উত্তেজনায় ভরা। পরের দিন একটু সাহস সঞ্চয় করে, সে ও একটু এগুলো আর আমিও একটু প্রশয় দিয়ে কাছে গেলাম। তারপর সুযোগ বুঝে হাসি, আনন্দ, গল্প আর আড্ডায় কেটে গেল আমাদের পুজোর ৪টে দিন। এইবার ফেরার পালা দুজনেরই। আচ্ছা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ছেলেটি আমার জ্যেঠুর এক বন্ধুর ছেলে ছিল, যে কিনা দিল্লি নিবাসী। তখন স্মার্ট ফোনের যুগ নয়, তাই মাঝে সাঝে ওই ল্যান্ড ফোনে কথাবার্তা, আর একে অপরের জন্মদিনে অবশ্যই উইশ করা। তার সাথে গিফট কিনে, কার্ড কিনে সেই গুলোতে যত্ন করে নিজের মনের কথা লিখে, লুকিয়ে রাখা পুজোর জন্য। সে এক অনন্য অনুভূতি।

ওর সাথে আলাপ হওয়ার পর থেকেই সারাবছর অপেক্ষারত থাকতাম পুজোর জন্য। কারণ বছরে ওই একবারই আমাদের দেখা হতো। এইভাবে বছর দুই কি তিন কাটলো। তারপর আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে, দিল্লিতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে যাওয়ার বায়না ধরলাম ,কারণটা আপনারা বুঝতে পারলেও, আমার কাছে কিন্তু আজও অজানাই আছে, যে কি ছিল সেইটা ? ভালোলাগা, না ভালোবাসা, না কি বন্ধু, কি যে নাম দেওয়া যায় সেই সম্পর্ক টাকে, তা নিয়ে আমায় আজও দ্বিধা গ্রাস করে রয়েছে।

যাইহোক তখন হয়তো সেইটাকেই প্রেম ভাবতাম। তা আমি ম্যানেজমেন্টে চান্স পেতে পেতে, সেই সময়ের মধ্যে সেও কলেজ ক্যাম্পাসিং এ চাকরি পেয়ে বিদেশ চলে গেল, আর তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই একে অপরের সাথে। তখন যোগাযোগের সুযোগও অতো ছিল না, আর সময়ের নিয়মে যে যার জগতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তারপর যা হয়, ওই বয়সের প্রেমের পরিণতি তাই হয়েছিল, কেউ আর কারোর খবরই পাইনি কোনদিনও। যোগাযোগের কোন ম্যাধম না। থাকলেও, স্মৃতির মণিকোঠায় কিন্তু আজও জ্বল জ্বল করছে সেই ২-৩টে বছর, যা এখনও মনে করলে মনে হয় সেই দূর্গা পুজোর বছরগুলো ছিল সবথেকে আলাদা “জীবনে অন্য এক দুর্গা পুজো” বছর ।

কবিতা

সায়ংকাল

ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল

তুমি এলে সন্ধ্যার আকাশ লহরী হয়ে ওঠে
নিশ্চুপ বাতাস লিখে রাখে তোমারে নাম
জানলার কাচে জেগে ওঠে মায়াচাঁদ
ম্যাগনোলিয়ার শাখায় পড়ে থাকে ছায়া।

তোমার চোখে দূর নদীর জল
যেখানে ডুবে আছে সময়ের ক্লান্তি
বুকের ভেতর বাজে অজানা শিহরণ
ধূসর পাতায় লাগে বসন্তরাগ।

তোমার জন্য সময় থমকে যায়
রাতের তারারা কাছে আসে
বসে থাকে কথাহীন ভালোবাসা

কেউ যেন রয়ে যায় বুকের ভেতর।

দেখা হবে মিলন মেলায়

ফিরোজ হোসেন

একদিন আমিও নিঃসঙ্গ হবো
কেও থাকবে না পাশে
চেনা সব মুখ ছবি হয়ে চলে যাবে
অজানা শেষ ঠিকানায়।
স্মৃতি ভাসবে শীর্ণ শরীরে
যদি বার্ধক্য আসে এ জীবনে।
কত স্মৃতি হাসি কান্নার
নিঃসঙ্গ হৃদয়।
গাছ থেকে ঝরে পড়বে
নিয়ম করে হলুদ সব পাতা
মাঝে মাঝে এ হৃদয় ছুঁয়ে যাবে
চিন চিনে ব্যথায়।
শুধু অবহেলায় হয়তো
থেকে যাবে স্মৃতির পাহাড়।
আপন ইশারায়
আঁকি বুঁকি কাটি নিঃসঙ্গ হৃদয়ে
একা একা নির্জনে।
 এখনও যারা আছ
মেতে এ ভুবনে ভালো থেকো
দেখা হবে ওপারের মিলন মেলায়।

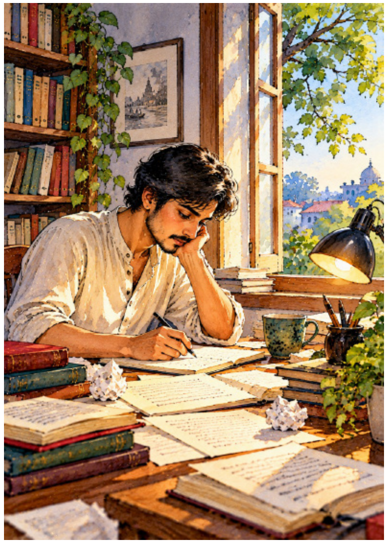

অসময়ের গল্প

রাজীব ঘাঁটী

কতগুলি না বলা কথা সাজিয়ে রেখেছি
পুজোর নৈবেদ্য ভেবে অক্ষর নাড়াচাড়া
করার মতো। এক বুক যন্ত্রণা জড়ো করি
পুড়িয়ে ফেলবো বলে, অথচ সময় ফিরিয়ে দেয়

একদিন আমার গল্প লিখবো বলে অক্ষর
সাজাচ্ছিলাম, অবাঞ্ছিত ঝড়ে উড়ে গেল
আমার ভাবনার শব্দগুলো। তারপর থেকেই
গল্প আগলে জীবনের মানে খুঁজে চলি।

সময়ের বেপরোয়া উত্তাপে উত্তাল হয়ে
পুড়িয়ে দিতে চাই বাড়তি কষ্টের কোষাগার
বাঁধাধরা অক্ষর যাপনে বিপর্যস্ত সময়,
সময়ের কাছে বন্ধক রেখেছি নিজেকে

সময়ের সুখ যাপনে সবাই বাঁচতে চায়, বাঁচেও
অথচ,অসময়ের গল্প লেখে না চেনা কেউ...

মায়ার বুদবুদ

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

তোমার শাড়িতে ঘুমের নক্সা
পাড়ে লেগে আছে মাটির চুমু

এ বাড়িতে তুমি এলেই
গাছগুলো কেমন যেন প্রেমিক

পাখিদের ঠোঁটে শব্দের নূপুর বাজলে
পালক উড়ে এসে পড়ে তোমার আলতা পায়

দিনটার নানা বাঁক যেন আনন্দধারার নেশা
আলোর দুষ্টুমি শুধু লেগে থাকে তোমাকে ছোঁওয়ায়

আমিও তখন পাহাড় উপত্যকা গুহা পেরিয়ে
কেমন যেন তুমি হয়ে যাই মাটির বিছানায়

তোমার হাসিতে বাঁশির সুর বাজতে থাকলেই
আদুল গায়ে তখন আঁকতে থাকি অবাধ্যতার সুখ

তোমার পুনশ্চ থেকে শুরু

দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়

১

তখন যা-ছিল সব বিগত পূর্ণিমা
আমার জোছনা আজ ন্যাংটো
স্মার্টফোনে
যত শোভা মেদমাংসে বিষাদ-রচনা

ভোলা নাচে, নেত্য করে... তাথৈ
তাথৈ ভোলা
শরীরী উৎসবে... ভোলা নাচে
তোমার চতুর বিভাজিকা
উন্মোচনে হাসে
যেন চাঁদ
যেন ফাঁদ

তবুও পূর্ণিমা

২

অচঞ্চল গাধারা এখনও শুয়ে আছে
আমাকে চেটেছে ন্যাংটো, গাধা নয়,
গাধার বিষাদ
ঘাপটি মেরে বসে আছে
ধূর্ত শিয়ালের মতো আলো
কী নির্ভার পুড়েছে পূর্ণিমা
ওপারে সহসা কাপড় খুলে

বাগিয়ে ধরেছে দণ্ড... সন্ত হে
আজ হবে মস্তি রাত্রিভর
হরিনাম সংকীর্তন হবে

মৃত রথী মহারথীদের
কুরুক্ষেত্র ছুঁয়ে এসে
নিশ্ছিদ্র প্রাসাদে নিঃস্ব বুড়ো নিধিরাম
ধরে আছে ধুতরোর বিচি
ধর্মীয় মাফিয়া যত প্রথা ভেঙে হামি খাচ্ছে
ভরা জোছনায়

হো হো...
হি হি...
কা কা কা...
কো কো কো...

টিংলা টিংলা

ডিজে বাজছে,
কঙ্গনা, আমোরে মিও
নাচিছে রাধিকা (মরি লাজে)

সব নগ্ন

তোমার পুনশ্চ থেকে শুরু
অবক্ষয়

জলজ কথা ২

জয়িতা বসাক

বয়েছি এখন নদীর মতোই একা
জালের মতোই জড়িয়ে রয়েছে ঢেউ
ভাটিয়ালি টানে হেঁটেছি রাতের স্রোতে,
উজান পেরিয়ে তবুও আসেনি কেউ

আলোর আশাতে জেগেছি কত না রাত
আকাশের গায়ে বুনেছি জরির বেশ
ভোর ছুঁয়ে দিলে স্বপ্নের তারা খসে
চোখ খুলে দেখি সব রূপকথা শেষ

দিনগুলো হাঁটে কাছিমের পিঠে চড়ে
সঞ্চয় খুলে, খুঁজে দেখি মাঝরাতে
নদীর ঘাটেতে ফেলে আসি ভাঙা স্মৃতি

রং

কৌশিক চক্রবর্ত্তী

আমাকে রাঙিয়ে দাও
অনড় হোয়াইট ওয়াশে
কিংবা কিছু লজ্জা নিবারণের কাপড়...

মিনিবাসের হ্যান্ডেল থেকে
জন্ম নেয় বিষাক্ত সাপ-
সিঁড়িতে দণ্ডায়মান অনুভূতি-
লোকে ভাবছে ঠেলে দেবে দূরে
মুখ আর ল্যাজের তাত্ত্বিক দূরত্বে...

রঙের গভীরে কিছু শব্দকোষ
উঁকি দিচ্ছে একা-
বিপাকে পড়ুক রাজবেশ...
আমার দেখানো পথে

ঘ[illegible]া-

গ[illegible]

গ[illegible] সংকেত...

সময় অসময়ে....

শ্রী সদ্যোজাত

কাগজের ফুলদানিতে ভেজা মাটির গন্ধ থাকে না...কাগজের ফুল কখনও বাসি হয় না।
যাদের ঘর ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছিল একদিন,
তাঁরা এখন ভাড়া বাড়িতে থাকেন.
কেউ একতলায় কেউ দোতলায়...
কেউবা চিলেকোঠায় অর্ধেক টাকায়।
বাড়ি ভাড়া প্রতি বছর বাড়ছে...সাথে ভাড়া বাড়িও।

মেয়াদ শেষ হলে হয়তো একদিন ভাড়া বাড়িটাও ছেড়ে দিতে হবে।
সারা জীবন একটা মানুষকে আঁকড়ে বেঁচে থাকাটা একটা দুর্লভ সাধনা একটা অলিখিত আসা যাওয়া

বেঁধে যাওয়ার মধ্যে বেধে যাওয়া থাকে না,
চুপ-কথার শান্তি থাকে রোজ দিনের আঁকিবুঁকি থাকে

সে আর বোঝে কে...বোঝাই বা কাকে!!!

সারাদিন এই একা থাকার সমুদ্র সুখ মুকাভিনয়
তবুও আরাধ্য পথটার একরদ্দি ক্লান্তি নেই
একটি কাঙ্খিত ধূসর অনিমেষ মৃত্যু নেই.....

অভিপ্রায়

সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জী

না মোটেও নিখুঁত নয়,
এ প্রেমেও মিশে আছে জল,
যেমন জল ধানের চারার বুকে ছিল।

ঘন হয়ে মিশে আছে কিনারায়
তুমুল ক্রোধ ও কামের সায়,
মিশেছে ইগো, আত্মপ্রত্যয়!
তবুও তো ভবি ভোলবার নয়...

তাই সাবধানে তোমাকে এড়াই
তবু আলগোছে কাছে থেকে যাই...

আসলে ভালবাসা ভীষণ ছোঁয়াচে, তার থেকে তোমাকে বাঁচাই!

আমাদের মূলধন বেশি ছিল কি?
সে ছিল একটা শীতের রাত
মেঘ শুনেছিল গল্প
বৃষ্টি বলেনি অভিপ্রায় কী?

প্রতি জন্মে এভাবেই তোমায় গিঁট দিয়ে রাখি, জেনো।

এত না চাওয়া না চাওয়ার বিপ্রতীপে তুমি আছো যে

অ … ইহ্ন এঁকেছিল, তুমি দেখেছ
সে …
গ … ক তুমিও তো চেয়েছো, দেখছি!

সেলাই

নীলার্ণব চক্রবর্তী

আমি তো তোমার দিকেই বন্দুকের নল তুলেছিলাম
সেইদিন—
তুমি বলেছিলে ওই বন্দুকের সামনে, আর্তনাদ করে,
‘এত সাহস তোমার, শোনো, আর কোনও দিনও আমি তোমার
সঙ্গে কথা বলব না—’
তার পর...
তুমি বন্দুকের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছিলে ক্রমে,
বলছিলে সেই গল্পটা—
বলেছিলে একটা-দুটো আর তিনটে গুলি গুরুম করলেই
কী রকম ভাবে জেগে ওঠে তোমার বডির ভিতর দিকটা—
বলছিলে, মৃতদেহ তিন দিন বন্ধুহীন ভাবে পড়ে থাকলেও

তা বেঁচে উঠতে পারে— তেমন ভিডিও তুমি নাকি
দেখেছ এই তো ক'-দিন আগেই—

বলছিলে তুমি... বলেই যাচ্ছিলে...
আমি হাসছিলাম হালকা হালকা করে... হালকা হালকা করে...
তোমার ঠোঁটের শুকনো লিপস্টিক
খুঁটতে খুঁটতে বললাম,
এই তো বললে কথাই বলবে না, এখন
তো থামছ না... থামছই না... কেন...

আমি কাঁথা সেলাইয়ের সুচ আর সুতো দিয়ে
তোমার ঠোঁটদুটো সেলাই করে দিতে শুরু করে দিলাম—
এইবার
কথা বন্ধ হচ্ছে আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
পড়ছে জামায়, মেঝেতে— তোমার বুক দুটো
কেঁপে উঠেও লজ্জাবনত হয়ে পড়েছে... আচমকা—

একটা খোলা জানালা চাই

আক্তারুজ্জামান মিন্টু

একটা খোলা জানালা চাই
যেখানে একটা সোনালি রঙের ফুল জারবেরা
সূর্যদেবী হয়ে উঁকি দেবে
ঝটপট করে কাটিয়ে দেবে ভিতর কক্ষে ছড়ানো ছিটানো টুকরো কাঁচের মতো তীক্ষ্ণ অন্ধকারগুলো।

সেটা খোলা জানালা
যেখান দিয়ে রোজ হুড়হুড় করে ঢুকে পড়বে দখিন হাওয়ার রাণী
এলোমেলো দোলে দুলিয়ে দেবে কবিতার ভরাট মলাট,পাণ্ডুলিপি, টেবিলের অগোছালো পত্রিকা।

কিন্তু, এই জানালার তো অনেক দাম

আমারতো এতো সাধ্য নেই!টাকাও নেই!

আমি কিভাবে দাম দিয়ে তা কিনি?

তবে,

আমার খরা পীড়িত অঞ্চলে এক টুকরো জমি আছে, সেখানে এই বর্ষায় একটি ঘন সবুজ অরণ্যের জন্ম হয়েছে।

আমি সেখানে একটি ভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করেছিলাম অনেক আগে, বৃক্ষটি বেশ উৎফুল্ল!

প্রকাণ্ড ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঝে মাঝে সেখানে আশ্রয় খুঁজে পায় কিছু পথিক।

শুনেছি,

সরকারী অফিসে পিয়নের চাকরি করা ছেলেটাও এমন একটা জানালা চায়। আমার সাথে ওর সখ্যতা আছে।

আমি স্মিত হাসি,বিস্মিত হই

টাকার দামে কি আর সবকিছু হয়?

জানালা কিনতে হলে তো পাখি হতে হয়

ওর কি ডানা আছে, যে ও উড়বে?

এর চেয়ে ঢের ভালো যদি আমি সেই বৃক্ষটির বদলে একটি খোলা জানালা পাই।

পুরাতন রোদ
মুনমুন ভৌমিক দাম

কিছুতো রেখে যাও ব্যথাহীন
শুধুই কথায় কথায় ভিড় জমে...
অযথা কলহ বিবাদ - ফেলে আসা কথার রেকাবি সাজায়,
দিনরাত চুমু দিয়ে যায়
আকাশ পাখি, কি জানি কি তার নামকরণ ,
হয়ত বা অমলতাশ অথবা রুদ্রপলাশ।
যেমন করে ছাতিম তলায় জমেছে শ্রাবণ
হয়ত বা কোপাই অথবা তিস্তার বৃষ্টি প্লাবণ
রোজকার সুখ দুঃখ,
ধুয়ে দায় বলিরেখা হরেক রকম।

কিছু রেখে যেও, সান্ধ্যগীতি, সলতে প্রদীপ,
যদি বলো, কুড়িয়ে রাখব বানভাসি দেশের মাটি, তারাখশা রাত ....

কিছুতো রেখে যেও পুরাতন রোদ অথবা চন্দন
শেষের কবিতার শেষ পাতা
হয়ত বা আহত কথাদের প্রতিক্ষা যেমন।

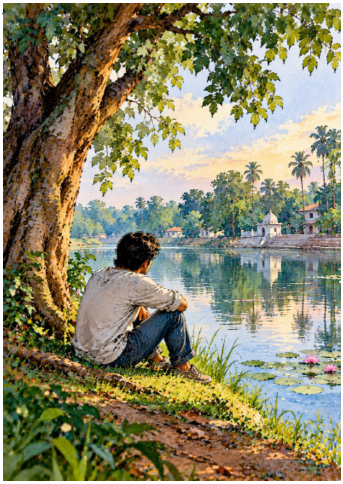

আত্মনৈবেদ্য

গৌরীশঙ্কর সিংহ

আমাকে আমার জলের সামনে দাঁড় করাই ;
হে বিপ্রতীপ আলো
হে সপ্তস্বরা,
আমাকে দেখো গানবিহীন,
বাকল থেকে মজ্জা স্পর্শ খুলে নাও এবার
দেখুক লোকে পৃথিবী বুক।

পথের পাশে আঁকব পথের দরদালান
ইচ্ছের নৈবেদ্য।

কতটা নেমেছ ভাসানপর্বের পর নিজের গভীরে ?
কাদামাখা চিবুক কার গোপনে রেখেছে সকরুণ হাত।
কার মায়ায় মিশে আছে নৌকোর ঘাত ?
নালাবেয়ে মাছশাবক এসেছে উঠোনের পাতে,
এবার বসি মুখোমুখি,
এবার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ছেলেবেলা।

আমাকে একবার আমার সামনে দাঁড়াতে বলি,
গানজড়িয়ে ঘুম আসে
ঘুমের কোন নামগান নেই।

শুধু সৃষ্টি স্বপ্নের সিলমোহর
একবার পড়ুক আমাদের বুকে..

আয়না

পিয়ালী মুখার্জী

কেমন আছো?
এই প্রশ্নটা তুমিই করলে প্রথম আয়না!
আমি দেখলাম নিজেকে...
আয়নার সথে আমার চিরকালের একটা দ্বন্দ্ব!

তুমি যে আমার ভালো মন্দ বিচার করো!

কঠিন মন, না কোমল হৃদয়
— তা শুধুমাত্র আয়নাই বোঝে!

আমার আয়নার কাচ বড্ড স্পষ্ট
সামনাসামনি স্তব্ধ দুটি মন, তুমি ও আমি!
সুখ দুঃখ হাসি কান্না
অভিনয়! দেখছে আয়না রোজ
আয়নাই আমাদের শুধরে দেয়, সে যে বড়, দর্শক বড় শ্রোতা!
চোখ মুছে ফের দাঁড়াতে হয়! নড়তে হয় , শুনতে হয়।

কথায় কথায় চোখ রাঙিয়ে খুব শাসনে জটিল অংক কষতে বসি
মনের খাতায় আয়নার সামনে, অসহিষ্ণুতায় আগুন ধরায় হতাশাগুলো।
আয়নায় উপলব্ধি করি
সংলাপগুলো ভেসে আসে —

আমি শুনতে পাই আমার নিরাবত

প্রশ্ন টা যখন কার দলে! আয়নাও

দীর্ঘ কবিতা

সর্ণালী মন্ডল

আর কখনো দুটো হাত এগোবে না ওই হাতের দিকে,
আর কখনো দুটো হাতের মধ্যে অন্য একটি হাত ধরা হবেনা শক্ত করে।
কারণ দুটো হাত গড়তে ভাঙতে শিখেছে।
কোন তৃতীয় হাতের প্রয়োজন আর হবে না কখনো।
কোন ছায়া এসে যখন ঘিরে ধরবে সেই ছায়াতে
মেশা হবে না আর কখনো।
ছায়া তো পড়বে বারবার,আবার একটি বড় ছায়ায় এসে ঢেকে দেবে পুরোটা।
তারপর আবার ছায়া হীন পৃথিবী।

বলো কি চাও ছায়া হয়ে বাঁচতে নাকি ছায়ার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে মিশিয়ে নিতে?
কিছু উপলব্ধি দূর থেকেই এখানে কোন
ছোঁয়া নেই শুধু ব্যাকুলতা।
সাধনায় যে অবয়ব ভেসে ওঠে দূরত্বগুলো
এক একটি সংখ্যা মাত্র।

দুর্গা

ছন্দা ঘোষ

রান্না তখন একটু বাকি
মাছ ভাজাটা শেষ,
ফোড়ন দিয়ে রান্না ডালের
গন্ধটা তো বেশ।

ছেলে বলে কলেজ যাব
খাবারটা দাও আগে,
মেয়ে বলল চুল বেঁধে দাও
নিজে করলে লাগে।

স্বামী আবার ওষুধ ভোলে
প্রেসার তার হাই ,
শ্বাশুড়ি মা চা না পেলে
চেঁচায় যাচ্ছে তাই ।

মাসকাবারি বাজার শেষ
গ্যাস বুকিং বাকি,

কাজের মাসি ঘষছে বাসন
না দেখলে ফাঁকি।

সব কাজই হাসি মুখে
সামলে দেয় ছন্দা ,
এমন ভাবে নিত্য জীবন
সকাল থেকে সন্ধ্যা ।

কুড়ি বছর পার হল যে
বোস ছেড়ে সে ঘোষ,
ছন্দা খুশি ছন্দ নিয়ে
নেই তার আফসোস।

পুজোর ছড়া

গৌতম চক্রবর্ত্তী

১. দুগ্গা দুগ্গা

এক দুর্গা ভাইকে নিয়ে
দেখে রেলের গাড়ি,
এক দুর্গা বাসন মেজে
ফিরছে তাড়াতাড়ি।

এক দুর্গা অফিসে যায়
ঝকমকে তার শাড়ি ,
এক দুর্গা শরীর বেচে
চাইছে টাকা কাঁড়ি।

এক দুর্গার চুলের মুঠি
মাতাল স্বামীর হাতে,
এক দুর্গার ফুটপাতে ঘর
ধাক্কা মাঝ রাতে।

এক দুর্গার লড়াই জীবন
চোখেতে রেখে চোখ,
এক দুর্গার হঠাৎ মরণ
লোক দেখানো শোক।

এক দুর্গা অন্ন বাড়ে

আদর করে হেসে,
এক দুর্গার সর্বনাশ
সত্যি ভালোবেসে।
সব দুর্গার এই সমাজে
মনের মাঝে বাস
সব দুর্গার অঞ্জলি হোক
থাকুক আশ্বাস ।

২. দুগ্গা গাড়ি

হাতি ঘোড়া নৌকা নয়
এবার ট্রাভেলার,
এ সি গাড়ি রাস্তা ভালো
নেই ঝাঁকুনি আর,

গণেশ তোর বাধ্য ছেলে
করবে না সে দেরি,
কার্তিকটা সাজে বেশ
টানুক চুলে টেরি।

লক্ষ্মী তোর শান্ত মেয়ে
ধীর স্থির মতি,
সরস্বতী পরুক জিনস্
শিক্ষা তার অতি।

মহেশ্বর নিপাট ভালো
বসুক সামনে সিটে ,
মহিষাসুরকে রাখিস চোখে
শয়তান মিট মিটে ।

কইরে মা হলো তোদের ?
হর্ন দিচ্ছে গাড়ী ,
দেখিস মা বদলে গেছে
মর্ত্যের হাল চাল ,
ফেরার গাড়ী কনফার্ম
তবে নো কার্নিভাল ।।

৩. মলি দিদি

আমরা তখন বড্ড ছোট
রোজ বিকেলে খেলা
মলি দিদি লিডার ছিল
করত শাসন মেলা

চড় চাঁটি কানমলাতে
মানত তাকে সব
মুখের ভঙ্গি করত এমন
থেমেই যেত রব

ঘোষ পাড়ার ঐ ট্যারা মনু
জোচ্চুরিতে সেরা
মলির কাছে গাঁট্টা খেয়ে
কদিন ছিল ফেরার

অষ্টমীর এক পুজোর রাতে
ভিড় জমাট প্যান্ডেলে
তিনটে ছোঁড়া কুপোকাত
মলির হাতের স্যান্ডেলে

তাইতো পাড়ার ছেলে ছোকরা
সমঝে চলত তাকে
সেই দিদিটা পুলিশ হল
চাকরি পেয়ে ফাঁকে

চারটে দিন থাকবি সুখে
চেনা বাপের বাড়ী।

মলি দিদি এখন শুনি
দারোগা এক থানায়
চোর বদমাস গুন্ডাদের
আচ্ছা করে ঠ্যাঙ্গায়।।

গল্প

অরুণাভ এবং সেই মাকড়সাটা

শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

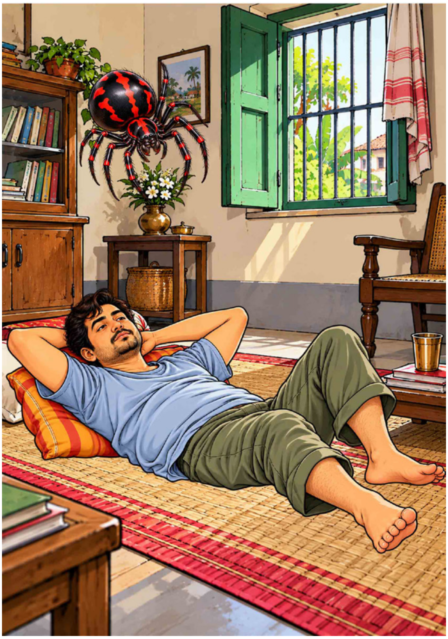

১

মাকড়সাটা অরুণাভর মতো, সঙ্গীহীন একাকি। সারাদিন নিশ্চুপ হয়ে ঘরের এক কোনটাতে পড়ে থাকে। নড়াচড়া নেই। এখানেও অরুণাভর সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে মাকড়সাটার। দেখতে অন্যান্য মাকড়সার থেকে একটু আলাদা। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, বুক আর পিঠে কালোর উপর লাল, লাল দাগ। পেটটা দেহের থেকে একটু বেশি বড়, ফোলা টাইপের। একটা পোয়াতি, পোয়াতি ভাব। যেন সদ্য বাচ্চা হবে। এরকম মাকড়সা এর আগে কখনো দেখেনি অরুণাভ। মাস দুই-তিনেক হল অরুণাভ বাইরে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এই ফ্লাটের চার দেওয়ালের মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে গৃহবন্দি করে ফেলেছে সে। এবারের বই মেলায় শেষ বন্ধুদের সঙ্গে হৈচৈ করেছিল সে। তারপরইজ্বরে পড়লো। দিন কয়েক ঘুস ঘুসে জ্বরে বেশ ভুগলো। সেরে উঠে অফিসেও জয়েন করল। কিন্তু দিন পনেরো যেতে না যেতে ফের সেই জ্বর, সঙ্গে এবার প্রবল পেট খারাপ।

এরপর থেকে জ্বর আর পেট খারাপটা যেন পিরিয়ডের মতো নিয়ম করেই আসতে লাগলো প্রতি মাসে। ডাক্তার চেঞ্জ করা হলো বিস্তর কিন্তু কেউই রোগটাকে ধরতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ওকে মেডিসিনের একজন বড় বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেল রোহিনী। তখন ওদের সুখের সংসার। হেমন্তের মতন ঝকঝকে আকাশ, মেঘের কোনও চিহ্নই নেই। কর্তা-গিন্নি দুজনেই আইটি সেক্টরে চাকরি করে, ভাল প্যাকেজ। সবেমাত্র বছর খানেক হল লাভ ম্যারেজ করে দুজনে নিউটাউনের একটি বহুতল আবাসনে তিন কামরার সুদৃশ্য ফ্ল্যাট কিনেছে। ফ্যামেলি প্ল্যানিং নিয়ে রোজ রাতেই আলোচনা চলছে। রোহিনী মা হতে আরও বছর দুয়েক সময় চায়। অরুণাভর অবশ্য এখনই বাবা হতে কোনও আপত্তি নেই। ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট দেখেই ডাক্তারবাবুর মুখটা কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল। অরুণাভর হোয়াইট ব্লাড সেল বা শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই কম। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরা পড়ল কালান্তক ব্যাধি। রোহিনী ব্যাপারটা নিতে পারেনি। পরদিনই বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে চলে গেছিল বাপের বাড়ি। আর ফেরেনি, ফোনও করেনি। ডিভোর্সের চিঠিটা এসে গিয়েছিল রেজিস্ট্রি পোস্টে। মিউচুয়াল ডিভোর্স চেয়েছিল রোহিনী। পত্রপাঠ স্বাক্ষর করে দিয়েছিল অরুণাভ। রোহিনীকে জোর করে আটকে রাখতে চায়নি সে। তাকে এই দায়িত্বভার থেকে মুক্তিই দিয়েছিল অরুণাভ। তারপর থেকে নিউটাউনের এই চোদ্দতলার তিন কামরার ফ্লাটেই স্বেচ্ছাবন্দি তাঁর জীবন। অরুণাভ সান্যাল দুর্গাপুরের ছেলে, আর রোহিনী শর্মার বাড়ি পড়াশোনা সবই আসানসোলে। কাজের সূত্রেই কলকাতায় এসে ফ্ল্যাট কেনা তাঁদের। ফলে কলকাতায় অফিস কলিগ ছাড়া ওদের তেমন কোনো বন্ধু নেই। অরুণাভর অসুখটার কথা জানাজানি হতেই অফিস কলিগরাও তাঁকে ত্যাগ করেছে। কেউই আর তাঁর বাড়িতে আসেনা। ভালই হয়েছে মনে মনে এখন ভাবে অরুণাভ। তাঁর এখন অনন্ত অবসর। মাঝে মধ্যে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে খুব। দুর্গাপুরে থাকতে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার মুখে খেলাধুলার পর ব্যারাজে গিয়ে হুল্লোর। গরম কালে যা শীর্ণকায়, বর্ষার সময় সেই দামোদরের রূপ দেখলে ভয়ে বুক কাঁপতো। বাবা-মা গত হয়েছেন বছর কয়েক হল, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই। অরুণাভ মাঝে মধ্যেই ভাবে নিজের ছেলেবেলা নিয়ে সে একটা গল্প লিখবে, কিন্তু সে লিখতে পারে না। কেবল স্মৃতিগুলো যখন তখন এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। পাড়ার এক কেষ্টদার সঙ্গেই যা অরুণাভর যোগাযোগ আছে। আর ন' মাস, ছ' মাসে আসে স্কুলের বন্ধু সন্দীপন দত্ত। সে এখন কলেজে বায়োলজির অধ্যাপক। সেও কলকাতাতেই থিতু হয়েছে। ফ্ল্যাট কিনেছে হলদিরামের কাছে। অরুণাভ একা মানুষ, রান্নার ঝামেলা আর রাখেনি। কেষ্টদার হোম ডেলিভারির ব্যবসা। সেখান থেকেই খাবার আনিয়ে মাস ছয়েক চলছে। মাস গেলে পেমেন্ট দিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে গেল। রান্না করা, বাজার করা, বাসন মাজার

কোনো হ্যাপা নেই। দু মাস পর পর তাঁকে একবার করে হাসপাতালে যেতে হয় বটে, তখন ওলা, উবের বুক করে নিলেই হল। ডাক্তারবাবু দেবাশিস ভট্টাচার্য ভালো মানুষ। অরুণাভকে চিনে গেছেন, তাই দু মাসের ওষুধ একবারে দিয়ে দেন। সরকারি হাসপাতাল থেকেই একবারে ওষুধ নিয়ে ফেরে অরুণাভ। এখন একটুতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। তাই বাড়ি থেকে একদমই বের হয়না। তাঁরই কেন এই অসুখ হল, কীসের দোষ ছিল তার? নিজের মনেই ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলে অরুণাভ। কেঁদেছে, আত্মহত্যা করতে গেছে কিন্তু পারেনি। একটি মাত্র আশা নিয়েই সে বেঁচে আছে একদিন না একদিন ঠিক ফিরে আসবে রোহিনী।মাকড়সাটাও তার মতো একা। অথচ একসময় অরুণাভর মতো মাকড়সাটারও সঙ্গী বা সঙ্গিনী ছিল। মাকড়সাটা পুরুষ না মাদি? অনেক বুঝতে চেষ্টা করেছে অরুণাভ। কিন্তু বুঝতে পারেনি। যেমন বুঝতে পারেনি, ওকে কেন ওর সঙ্গী বা সঙ্গিনীরা ছেড়ে চলে গেছে? একা থাকতে থাকতে মাকড়সাটাও কি তার মতোই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত? মাকড়সাটা সারাদিন একজায়গাতেই চুপ করে বসে থাকে। আচ্ছা, মাকড়সাটা এখান থেকে চলে যায় না কেন? সবাই যেমন ওকে ছেড়ে চলে গেছে। মাকড়সাটার শীর্ণকায় চেহারা, কেবল পেটটা বড়। দেখে মনে হয় শিগগিরি বাচ্চা হবে? আচ্ছা তাহলে বাচ্চাগুলোর বাবা কে? নিজের মনে নিজেই হেসে ফেলে অরুণাভ, আচ্ছা সে কি সত্য পাগল হয়ে যাচ্ছে? তার অত ভাবার কী দরকার?অরুণাভ তবু ভাবে। আসলে ঘরে সেছাড়া ওই মাকড়সাটাই একমাত্র জীবিত প্রাণী।অরুণাভর কোনোদিনই পোকা কীট পতঙ্গদের প্রতি প্রেম উথলে ওঠেনি।চোদ্দতলার এই ফ্ল্যাটে মশা, মাছি, ইঁদুর, বাঁদুর, কাক-পক্ষীরও প্রবেশ নিষিদ্ধ।কিন্তু কী করে যেন এই একপিস মাকড়সা ঢুকে পড়েছে রবাহূতের মতো, তাই আরতাকে মারেনি অরুণাভ। ও রয়ে গেছে মাকড়সা হিসেবে নয়, জীবনের প্রতিভূ হিসেবে।এভাবেই কোনও কথা না বলে ঘরের দুটি ভিন্ন ধর্মী প্রাণী পরস্পরের দিকে তাকিয়েথাকে অহরহ। নিজেদের মনেই কথা বলে তারা। অপর পক্ষ কি বুঝল, বা না বুঝল,তাতে তাদের থোড়াই কেয়ার। একলা ঘরে দুজনেই তাই দুজনের বেঁচে থাকার পরিপূরক।

২

সেদিন অরুণাভকে দেখতে এসে মাকড়সাটাকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন চমকে গেল সন্দীপন দত্ত। অরুণাভর হাতে গোনা বাল্যবন্ধুদের মধ্যে একজন সে। এখন একটি কলেজে বায়োলজির অধ্যাপক। ঘরের কোনে মাকড়সাটার দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে শেষে বিস্ময়ের স্বরে সন্দীপন জিজ্ঞাসা করল এই প্রাণীটা এখানে এল কী করে? এতো এখানকার বাসিন্দা নয়।

এখানকার বাসিন্দা নয় মানে? এই ঘরেই তো আছে মাস পাঁচ- ছয়েক ধরে। আগে একটি সঙ্গী বা সঙ্গিনীও ছিল, কিন্তু সেটাকে এখন আর দেখতে পাই না। বোধহয় বনিবনা

হয়নি বান্ধবীর সঙ্গে বা মরে টরে গেছে হয়তো। মরে যায়নি, ওকে খুন করা হয়েছে। মাকরসাটার দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে বলে ওঠে সন্দীপন। আমি অকারণে কোনও জীবকে মারি না। বাড়িতে তো আর কেউ নেই। তাই ওকে কে খুন করতে যাবে? বন্ধুর কথায় হেসে বলে ওঠে অরুণাভ। তুই মেরেছিস তো বলছিনা। আমি জানি তুই একটা পিঁপড়েকেও মারিস না, বিনা কারণে। ওই মাকড়সাটা নিজেই নিজের বয়ফ্রেন্ডকে খুন করেছে। বলতে পারিস খেয়ে ফেলেছে নিজের পার্টনারকে।

মানে? অরুণাভর গলায় বিস্ময়।

তুই ক্যানিব্যাল সেক্স সম্পর্কে কিছু জানিস?

সন্দীপনের প্রশ্নে মাথা নারে অরুণাভ।

ক্যানিব্যাল সেক্স মানে, যৌন মিলনের পর নিজের পুরুষ সঙ্গী বা সঙ্গিনীকেই খেয়েফেলা। এটা প্রকৃতির একটা বিস্ময় বলতে পারিস। এক ধরণের মাকড়সার মধ্যে এইক্যানিব্যাল সেক্স দেখা যায়। যৌন মিলনের পর যারা তাদের পুরুষ সঙ্গীটিকেই মেরেখেয়ে ফেলে। বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এই ঘটনায় অবাক। তোর ঘরে এই যে বাসিন্দাকে দেখছিস, ইনি আদতে আমেরিকার বাসিন্দা। নাম ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার। বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটরোডেকটাস জেনাস। গোদা বাংলায় কালো বিধবা মাকড়সা। দেখতে কালো বলে ব্ল্যাক, আর সোহাগ রাতেই বিধবা হয় বলে উইডো। কাঁধ ঝাকিয়ে মুচকি হাসে সন্দীপন। তবে সিরিয়াস ব্যাপার হলো এদের কিন্তু বিষ আছে। কামড়ালেনার্ভ সিস্টেমের উপর প্রভাব ফেলে। আমেরিকায় এর কামড়ের ইঞ্জেকশনও আছে।ঠিক সময় ইঞ্জেকশন দিলে ভয়ের কিছু নেই। মারা যাবার খবর খুব একটা পাওয়া যায়না। কিন্তু এখানে সচরাচর দেখা যায় না বলে সম্ভবত ইঞ্জেকশন পাওয়া যায় না।তাই ভেরি ভেরি সিরিয়াস। কাল কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে এসে তোর ফ্ল্যাটটাইতল্লাশি চালাতে হবে। মনে হয় ওর ছানা পোনাও আছে এদিক ওদিক লুকিয়ে। তুই আজরাতটা এই ঘরে কাটাস না। পাশের ঘরে ঘুমাস। সাবধানের মার নেই।কিন্তু ব্যাটা সুদুর আমেরিকা থেকে এখানে এল কি করে?খুব সম্ভবত তোর বা রোহিনীর লাগেজের সঙ্গে। তোরা যখন আমেরিকা থেকেফিরেছিস, ওরাও তখন এক জোড়া তোদের লাগেজের সঙ্গে মিশে এদেশে চলে এসেছে।তারপর এদেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে। ওদের তো আর পাসপোর্ট, ভিসা, ইমিগ্রেশনক্লিয়ারেন্স লাগে না।কাল সক্কাল সক্কাল ফের দলবল নিয়ে আসবে বলে সন্দীপন বিদায় নিল।ক্যানিব্যাল সেক্স। মাথার মধ্যে বার বার কথাটা হন্ট করতে থাকে অরুণাভর। কিবিচিত্র এই জীব জগত। মিলনের সুখ-সাগরে ভাসতে ভাসতে পুরুষ সঙ্গীটিকে চিবিয়ে খেয়ে নেয় মাদি মাকড়সা। সন্দীপন বলছিল বিজ্ঞানীদের মতে এর পিছনেও নাকিরয়েছে প্রকৃতিতে টিকে থাকার লড়াই। পুরুষ সঙ্গীর দেহের হাড়, মাংস, মজ্জায় যে প্রাণীজ প্রোটিন থাকে তা খেয়ে নাকি বেশি সংখ্যক সুস্থ, সবল সন্তানের জন্ম দিতে পারে মা মাকড়সা। দ্বিতীয়ত মাকড়সা

সমাজে পুরুষের সংখ্যা অধিক। ফলেমিলনের পর মৃত্যু না হলে সঙ্গিনী নিয়ে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবার প্রবল সম্ভাবনারসৃষ্টি হতো, তাই হয়তো প্রকৃতিই এমন চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স পদ্ধতিতে জন্মহারনিয়ন্ত্রণ করে চলেছে অবিরত।মাকড়সা সমাজে তাই এই আত্মরতির কনসেপ্ট অবাক করা ব্যাপার হলেও যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যা কী? ভাবতে বসে অরুণাভ। তার কিসের দোষ ছিল? সে তো যায়নি ঊর্মির কাছে। তাহলে কেন ঊর্মি, ঊর্ণনাভর মতো তাকে গ্রাস করলো? তার জীবনকে এক রাতের প্রলোভনে ভেঙেচুরে তছনছ করেদিল?

সেদিন প্রবল বৃষ্টি পড়ছিলো। ঊর্মি, অরুণাভ, রোহিনী শুধু যে অফিস কলিগ ছিল তাতো নয়, তাঁরা ভালো বন্ধুও ছিল। রোহিনী সেদিন অফিস যায় নি, বাড়িতে বসেই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছিল। অরুণাভ অফিস ফেরতের পথে ঊর্মিকে নিজে ড্রাইভ করে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। ঊর্মিই বাড়িতে চা খেতে ডাকল। রাত হয়ে গিয়েছিল তবু সেই ডাককে উপেক্ষা করতে পারেনি অরুণাভ। ঊর্মি কেষ্টপুরে একাই থাকে ফ্ল্যাট নিয়ে। সেই চা খেতে যাওয়াটাই কাল হল অরুণাভর জীবনে। বাইরে প্রবল বৃষ্টি, আর ঘরের মধ্যে দুটি মোম পাশাপাশি জ্বললে যেমন একে অপরকে আলিঙ্গন করতে থাকে শিখা দুটি, তেমনি মিলে গিয়েছিল দুটি শরীর। কিন্তু মিলনটা সুখের হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই অরুণাভর শরীরে ধরা পড়েছিল এইচআইভির মারণ ভাইরাস। সব জেনেশুনে কেন এমনটা করেছিল ঊর্মি? এটা কি ক্যানিব্যাল সেক্স নয়? কথাটা চাপা থাকেনি। সব জেনে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল রোহিনী। পারেনি। তারপর সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে গিয়েছিল বাপের বাড়ি। অরুণাভ রোহিনীকে দোষ দেয় না। সত্যি ওর দোষ কোথায়? তবে রোহিনীকে অরুণাভ আর আটকায়নি। ফিরে আসতেও বলেনি। বলার মতো তো মুখ ছিল না তাঁর।

৩

ভোরবেলায় দরজায় কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অরুণাভর। এতো সক্কাল সক্কাল আবার কে এল? ঘুম চোখে বিরক্ত মুখে দরজা খুলেই ভূত দেখার মতন চমকে উঠল সে। দু হাত দুরে তাঁর সামনে দাড়িয়ে রোহিনী। অরুণাভ এতটাই অবাক হয়ে গেছেযে কথাই বলতে পারছে না। কোনও কথা না বলে রোহিনী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাল রাতে সন্দীপন ফোন করে বলল ঘরের মধ্যে তুই নাকি ব্ল্যাক উইডো মাকড়সাপুষছিস?কী সাংঘাতিক মানুষ রে তুই? চলে গেলাম একটা ফোন পর্যন্ত করলি না। রোহিনীর গলায় চাপা কান্না। প্রাণপণে লুকাতে চাইছে সে।

কী বলতাম বল তোকে? আমি অসুস্থ। আমার চিকিত্সার সময় পাশে থাকিস, চলে যাস না। এটাই বলতাম তো তোকে। বিশ্বাস কর তোকে এই কথাটা হাজার বার বলতে চেয়েছি বন্ধু, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

আমার কথা ছাড় তুই কেমন আছিস বল?

কেমন আর থাকবো বল? তুইও তো আমার শরীরে এইচআইভির বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিস।

রোহিনীর দু চোখে বাঁধ ভাঙা অশ্রুর ধারা।

কিছুক্ষণ পর চোখের জল মুছে রোহিনী বলে ভালবেসে মরার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম আমাদের তিনজনের মধ্যেকার প্রেম আসলে আত্মরতি। যেখানে তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই ভাবলাম আয়ু যখন সিমিত তখন একসঙ্গেই পাশাপাশি থেকে মরি। আর কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করলে তো তাঁকেও ঠকানো হবে। চিকিত্‌সক বললেন প্রথম স্টেজে এইডস ধরা পড়লে আর নিয়মিত ওষুধ খেলে নাকি বিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা যায়। ওই সময়টুকুই না হয় প্রাণ ভরে বাঁচি দুজনে। অরুণাভকে আঁকড়ে ধরে রোহিনী। মাকড়সাটা তখনও ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাইরে তখন মেঘ কেটে পুজোর রোদ উঠেছে।

নিবন্ধ

শৈশবের দোরগোড়ায় ডিজিটাল প্রহরা

কণাদ দাশগুপ্ত

শিশুর হাতে স্মার্টফোন উঠেছে, কিন্তু তার সঙ্গে কি শৈশবটিও স্মার্ট হয়ে উঠেছে? বরং বিপরীত আশঙ্কাটিই প্রবল। যে বয়সে চেনার কথা মাঠ, বই, বন্ধু আর বিকেলের আলোয়, সেই বয়সেই শিশুর সামনে খুলে যাচ্ছে এমন এক ডিজিটাল জগৎ, যার দরজা সহজ, কিন্তু বেরোনোর পথ সব সময় সহজ নয়। সেখানে শিক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি অপেক্ষা করছে আসক্তি, সাইবার বুলিং, অশ্লীলতা, প্রতারণা, অপরিচিতের প্রভাব এবং ব্যক্তিগত তথ্যের বাণিজ্য। সবচেয়ে বড় কথা, শিশুর মনোযোগকেই সেখানে পণ্য করে তোলার ব্যবসা চলছে।

এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডার প্রস্তাবিত ‘সেফগার্ডিং হেলদি ইন্টারনেট এনভায়রনমেন্টস ফর লিটল ডিজিটাল-নেটিভস’ বিলটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত আইনে ১৩ বছরের কম বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অভিভাবকের সম্মতি বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সিদের জন্য পৃথক অনলাইন নিরাপত্তাবিধির প্রস্তাবও রয়েছে। অভিভাবকদের জন্য ‘প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ড্যাশবোর্ড-এর মাধ্যমে সন্তানের

অনলাইন কার্যকলাপ, গোপনীয়তা-সংক্রান্ত সেটিংস এবং স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব—শিশুর অনলাইন আচরণ বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত প্রোফাইল তৈরি বা সেই তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপন দেখানো বন্ধ করা। সংসদ মুলতুবি থাকায় বিলটি এখনও পেশ হয়নি; তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। কিন্তু সমস্যাটি আর এড়িয়ে যাওয়ার নয়।

কারণ, শিশুরা শুধু ইন্টারনেট ব্যবহার করে না; ইন্টারনেটের ব্যবসায়িক কাঠামোও তাদের ব্যবহার করে। প্ল্যাটফর্মের আয় নির্ভর করে ব্যবহারকারীর মনোযোগ ধরে রাখার উপর। অ্যালগরিদম তাই এমন কনটেন্ট সামনে আনে, যা চোখ সরতে দেয় না। যে আত্মনিয়ন্ত্রণ একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাছেই কঠিন, তা শিশুর কাছে প্রত্যাশা করা আরও অবাস্তব। ফলে দায়িত্ব শুধু পরিবারের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না।

তবে সুরক্ষার নামে রাষ্ট্রীয় নজরদারিও গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত পরিসর যেন নষ্ট না হয়, আইনে সেই সীমারেখা স্পষ্ট থাকা জরুরি। একই কারণে শুধু বয়সের নিষেধাজ্ঞাও যথেষ্ট নয়। বয়স লুকিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা বা আরও অনিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্মে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সমস্যার চরিত্র বদলাবে, সমাধান হবে না।

প্রয়োজন তাই তিন স্তরের সুরক্ষা—

(১) পরিবারের সচেতনতা, (২) স্কুলের ডিজিটাল শিক্ষা এবং (৩) প্রযুক্তি সংস্থার বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা। স্কুলে শেখাতে হবে ব্যক্তিগত তথ্যের মূল্য, সাইবার বুলিং, প্রতারণামূলক লিঙ্ক, অনলাইন পরিচয়ের ঝুঁকি এবং অ্যালগরিদমের প্রভাব। প্ল্যাটফর্মগুলিকেও শিশুবান্ধব নকশা, নিরাপদ ডিফল্ট সেটিংস এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রযুক্তি থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা, কাজ ও যোগাযোগের সঙ্গে ডিজিটাল দুনিয়া ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। লক্ষ্য তাই প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করা নয়; শিশুকে এমন প্রযুক্তি-পরিবেশ দেওয়া, যেখানে সে ব্যবহারকারী থাকবে, পণ্য হয়ে উঠবে না।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি শুধু ১৩ বছরের নীচে অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে কি না, তা নয়। প্রশ্ন হল, শিশুর মনোযোগের মালিক কে—শিশু নিজে, তার পরিবার, না কি অ্যালগরিদম?

শিশুর হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেওয়া সহজ। কঠিন হল এমন একটি ডিজিটাল পৃথিবী তৈরি করা, যেখানে মোবাইল শিশুর শৈশব কেড়ে নিতে পারবে না। সেই কঠিন কাজটির দায়িত্ব পরিবার, স্কুল, প্রযুক্তি সংস্থা এবং রাষ্ট্র— সবার। কারণ প্রযুক্তির যুগে শিশুকে পৃথিবী থেকে আড়াল করা যাবে না; কিন্তু শিশুর নির্মল বয়সটিকে প্রযুক্তির বাজারে পণ্য হতে না দেওয়াই এখন আসল পরীক্ষা।

নিবন্ধ

বিজয়ার দিন সিদ্ধি তৈরি হত বাড়িতে

সবুজ মুখোপাধ্যায়

পুজো তখনও এরকম কর্পোরেট রূপ ধারণ করেনি। জাঁকজমকপূর্ণ বিখ্যাত পুজো হত ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেককেই শিরোনামে আসতে হবে, এমন কোনও দায় ছিল না কারুর। পাড়ার পুজোগুলোর প্যান্ডেল হত খুব সাধারণ। কোনো থিম-টিমের বালাই ছিল না। সোজা ডেকরেটর ডাকো, প্য়ান্ডেল তুলে দাও। আর বিখ্যাত পুজা বলতে বুঝতাম উত্তর কলকাতার কিছু পুজো আর দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রিনের মতো হাতে-গোনা কিছু পুজো।... তখন পাড়ার পুজোর চাঁদা ছিল ২ টাকা থেকে ৫ টাকার মধ্যে। কোথাও বড়জোর ৫ টাকা। আর পুরস্কার বলতে ছিল একমাত্র এশিয়ান পেইন্টস। সেটাও তখন সদ্য শুরু হয়েছে। আর তা নিয়ে হইচইয়ের ব্যাপার ছিল না একেবারেই।.. খুব ছোটবেলায় দাদাভাই গুনেগুনে ঠাকুর দেখত। চারদিন এ-বেলা ও-বেলা মিলিয়ে একবার একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাতে দাদাভাইয়ের কী আনন্দ! গাড়ি ভাড়া করে ঠাকুর দেখতে

যাওয়ার চল তখনও সেভাবে শুরু হয়নি। আমরা পায়ে হাঁটতাম আর বাসে চড়তাম।... ছোটবেলায় দুর্গাপুজোর আনন্দ শুরু হত ঢের আগে। তাই বলে আনন্দের আতিশয্য ছিল না সেভাবে। বাড়ি থেকে এক সেট জামা-প্যান্ট পেলেই খুশি। আর এর সাথে 'এক পাটি' জুতো জুটলে তো কথাই নেই।... মহালয়ার ভোরে ঘুম-চাখে উঠে বুঝতাম— পুজো এসে গেছে। বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ভোর চারটের সময়ে উঠে একটা রেডিয়ো সেটের সামনে বসে যেতাম। ... পঞ্চমীর দিন কি তার আগের দিন স্কুলে 'শারদোৎসব' হয়ে ছুটি পড়ত। এর পরের আকর্ষণ ছিল আমার দুই খুড়তুতো দিদি— মামদি আর মুনিমদি। এরা দুজনেই সেজকাকার মেয়ে। সেজকাকিমা ফরাক্কার স্কুলে পড়াত। পুজোর সময়ে প্রতিবার ওরা এলে দিনগুলো ফুল হয়ে ফুটত। আর পুজোর দুদিন পর, দ্বাদশীর দিন সকালবেলায় সকালবেলা অভ্যেস মতো ওদের ঘরে গিয়ে দেখতাম ওরা নেই, চলে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর সব ফুল যেন ঝরে পড়ত।... দিদিরা যেদিন এসে পৌঁছত, সেদিন থেকেই আমরা প্ল্যান করা শুরু করে দিতাম— কোনদিন কোন সিনেমা দেখতাম। এই তালিকায় যেমন হিন্দি ছবি ছিল, তেমন পুজোয় মুক্তি-পাওয়া নতুন বাংলা ছবিও ছিল। আবার পুরনো দিনের 'হারানো সুর'ও ছিল। শ্যামানন্দ রোড থেকে পায়ে হেঁটে কতক্ষণই-বা লাগত উজ্জ্বলা, বসুশ্রী, বিজলী, ভারতী, পূর্ণ, ইন্দিরা, রূপালি, কালিকা, প্রিয়া, মেনকা-র মতো ডজনখানে সিনেমা হল-এ পৌঁছতে! আশির দশকের শেষ অবধিও রিয়ার স্টলে সিনেমার টিকিটের দাম ছিল ২ টাকা ৪৫ পয়সা বাংলা ছবির জন্য আর হিন্দি ছবির জন্য ২ টাকা ৯০ পয়সা। ... পুজোয় বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরতো। দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতা অবধি আমরা চষে ফেলতাম। খাওয়াদাওয়ার বাহুল্য ছিল না। মিষ্টির দোকানে মিষ্টি বা দই। তবে কলেজ স্ট্রিটের ঠাকুর দেখতে যাওয়ার দিন পেটেন্ট ছিল প্যারামাউন্টের সরবত। ... দশমীর দিন বাবা বাড়িতে সিদ্ধি বানাত। কোনো বনেদিয়ানা ছিল না কোনোকালেই। একেবারে পাতি মধ্যবিত্ত। তবু সিদ্ধি যে কী এলাহি কায়দায় বানান হতক, তা আজো মনে আছে। কালীঘাটের কানো একটা লাইসেন্স প্রাপ্ত দাকোন থেকে সিদ্ধি কিনত বাবা। তার সঙ্গে কিনতে হত সিদ্ধির মশলা। সেটা অন্য কোনো দোকান থেকে। দশমীর দিন বিকেলবেলায় ওই সিদ্ধি বাটা হত ঠাকুরঘরের শিলনোড়ায়। তারপর বাজার থেকে বরফ কিনে আনতে হত। আশির দশকের গোড়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারে ফ্রিজের চল ছিল না বললেই চলে। এরপর মিষ্টির দোকান থেকে আনতে হত গোলাপ জল। আর, এক গামলা দুধ তো আগে থেকেই তোলা থাকত। সিদ্ধি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তালপাতার হাত-পাখায় প্রত্যেককে ন-বার করে লিখতে হত— শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়। তারপর দুর্গাঠাকুরকে উৎসর্গ করে, পূর্বরুরুষদের ছবিতে প্রণাম করে, বাড়ির সকলের সঙ্গে বিজয়ার কোলাকুলি আর প্রণাম সেরে সিদ্ধি খাওয়া হত।

সকল পাঠক ও দর্শকবন্ধুদের জানাই

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গোটা বিশ্বজুড়ে এখন এক অদ্ভুত অস্থিরতা।
গলছে বরফ, দুষিত হচ্ছে বাতাস, মাটি হারাচ্ছে উর্র্বতা।
দায়ী আমরা। গোটা মানুষ জাতি ছুটছে বাধনহারা
উন্নয়নের দিকে। আর সেখানেই আমরা ডেকে আনছি
নিজেদের সর্বনাশ। ধ্বংস করছি প্রকৃতিকে।
বিশ্বকে বাঁচাতে, পরিবেশ বাঁচাতে
হাত বাড়ান গঙ্গা মিশনের দিকে
আমাদের সকল প্রয়াস গড়ে তুলবে
এক সবুজ পৃথিবী